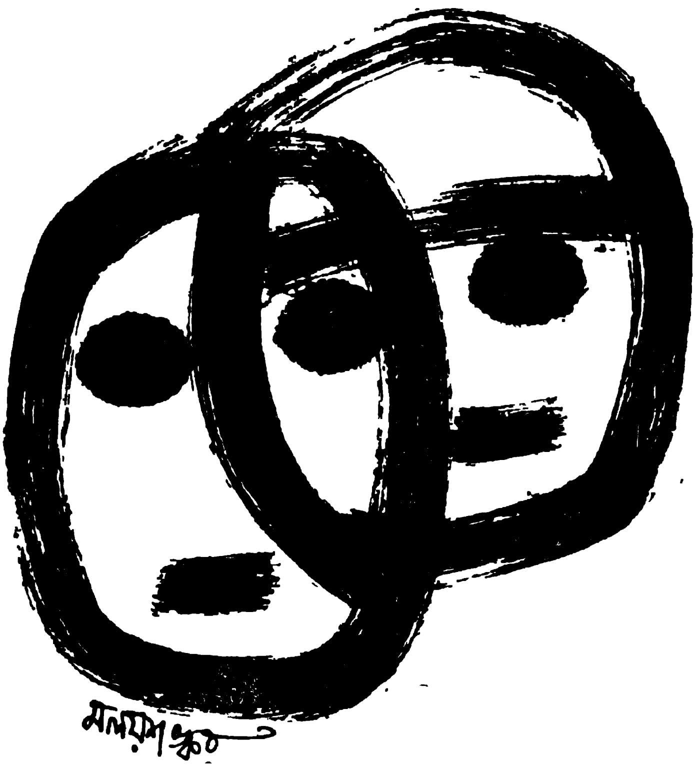
পিতা-পুত্র

চিত্ত সিংহ



৪, ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা—৭০০০০৪
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫৭ ২বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা -৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬২

প্রকাশক :
অসীম রায়
সুজনী
৪ ভুপেন বোস এভিন্যু
কলিকাতা-৭০০০০৪

মুদ্রক :
চন্দন চৌধুরী
সুজনী প্রেস
পোঃ প্রফুল্ল কানন
কলিকাতা-৭০০০৫৯

প্রচ্ছদ : চিত্ত সিংহ

অলংকরণ : মলয়শংকর দাশগুপ্ত

দুর্গম সাহিত্য-যাত্রার সহৃদয় সমমর্মী ও প্রাণবন্ত সহযাত্রী

পবিত্রকুমার ঘোষকে

সপ্রেমে ॥

পিতা-পুত্র

প্রথম পর্ব ঃ ভুবনের কাহিনী

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ধনপতি উপাখ্যান

তৃতীয় পর্ব ঃ পিতৃ অন্বেষণে শ্রীমন্ত

চতুর্থ পর্ব ঃ শ্রীমন্তের অন্তিম মাতৃ-সম্বোধন

প্রথম পর্ব ❦ আদি কাহিনী

১

মানুষ মানুষ-ই, তবু—

০

পেশায় বদ্যি, উপাধিও তাই। জাতে?

বলিত, বত্রিশঘরি কায়েত।

হয়ত! হয়ত নয়। কি আসে যায় বত্রিশ না চৌষট্টিতে? কুলীন, কায়েত না বাওনে? যদি পঞ্চমও হয় তাতেও বা কি? হাত-পা, চোখ-মুখ, বুক-পেট সবই আছে। মাথা আছে, মাথা ব্যথাও। হাঁটে দু'পায়ে, খায় হাতে, রক্তের রঙও কালো নয়, নীল নয়,—মানুষই তো! তাহলে? মাথায় ত আর শিং নেই, কিম্বা পোঁদে ল্যেজ।

মানুষটা বেঁটে খাটো, কালোকুলো, শক্ত সমর্থ, ডাঁটোও বটে, তবে বদরাগী। রাগলে জানোয়ার কি তারো বেশি। তা গুঁতোনোর ঠেলায় অস্থির সাঙ্গোপাঙ্গরা নেশাভাঙ্ ধরিয়ে দিলে। এখন রাগ মরেছে, গুঁতোয় না। সব্বাই নিশ্চিন্দি। বরং বলি, নেশার মৌতাতে সব দায়-দায়িত্ব ভুলে থাকে, মনেও রাখে না সংসার আছে, মাগ-ছেলে। তা বলে পেশার দায়িত্ব ষোলো আনার ওপর বত্রিশ আনা। সেখানে পান থেকে চুন খসার জো নেই। ডাকসাইটে বদ্যি।

০

কালটা সেকাল। যেকালে তিন দেশ থেকে আসা তার পড়োতে ছ' ছ' মাইল কাদা-মাটির রাস্তা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে হত ইংরিজী জানা এফ, এ পাশ বিনোদ মাষ্টারের কাছে—যদি মন্দ খপর থাকে, যদি সর্বস্ব ভাসি গিয়ে থাকে, যদি—তখন গোরা সাহেব-সুবোরা ভালো মত জাঁকিয়ে বসে দেশ জুড়ে দাপাদাপি করছে, কলের জোরে চাকার ওপর দিয়ে সার সার ঘর ছুটছে দেশের এই থেকে ওই, খবর ছুটছে খাম্বার মাথায় টানটান তারের মধ্যে দিয়ে, ভয়ে ভয়ে থরহরি কাঁপছে দেশ-গাঁ। খবর—

সাহেব সুবোরা রাগলি আর রক্ষে নাই, জ্যান্ত মানুষ পোঁতে, ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেয়, গুলিতে খুলি উপড়ায়, এক কোপে দুই খান।

এ আর এমন কি! ঠাকুদ্দার কালে, কি তারো আগে, সেই মান্ধাতার কালে গো,

মোছরমানরাও পেরথম পেরথম ওই-ই ছিল। সামনে পেলে কচু কাটত। তখন "ব ভিন দেশ থেকে আসা, তেজ কি! তাপ কি! ভাপেই থাঁক! তা কালে কালে, জল-মাটির সুহাগ বাল কথা আছে না, দেশকালের ধরণ বলি কথা আছে না, দিনে দিনে সাদী-সুদো, ঘর-সংসার বেঁধে এখন ভাই-বেরাদর; তোমার আমার মতো। তা বেন গো, আমি-তুমিই। ঘেষাঘোষ, পাশাপাশি—মোদ্দা এখন নাঙ্গা না করলি আলাদা করে কার সাধ্যি।

তাহ'লি গোরারাও মনিষ্যি বটে!

সন্দ কি। তবে বড্ড রাঙ্গা।

শুান, ভিনদিশি মোছরমানরাও তাই ছিল।

ছিল। তারপরে দিনে দিনে রঙ মরেছে, ঝাঁজ, ঝাল। এখন ইদিশী।

তোর মাথা! সৈয়দ কাজীরা তো—

সে সেকেলে ছিল। এখন দো আঁশলা। রক্ত কি আর খাঁটি থাকে?

কেন? তোর-আমার? আমরা তো—

খাঁটি গব্য ঘেত্ত্য। হেন্দু! বটে! ওরে শালা, জলে মুখ দেখ, নিঘ্যাত হদিশ মিলবে। নই?

না গো আমরাও আঠারো আঁশলা। ঠেলায় পড়ি হরি ডাকতিছি।

সেই থিকা কি যে ঘেনর ঘেনর লাগিছিস্। রাখ তোদের ওসব গালগপ্প। কল্কেটা বাড়িয়ে বরং সাবসুবোর কথা ক', ভয়-ডরটা কাটুক। বদ্যি মুখ খোলে। তা ওই যে বললি গলা বাড়িয়ে, বড্ড রাঙ্গা—কেমন রাঙ্গা গো? সোনার পিরতিমের মতো?

অত না। সুবল জানায়।

দেখিছো? রাখহরি শুধোয়।

আমি? ইয়া আল্লা! বলি এ জন্ম ত এখেনেই কাটল, এই গাঁ-গেরামে। ইস্টিশানের দিক চিনি নাই ত সাহেব!

তাহলি শালা গপ্প ফাঁদলি যে বড়।

ও মশায়দের বার বাড়ীতে শোনা।

ও হরি! সব না দেখা গপ্প! তুই না—

কি-ই! তুই ভূত দেখেছিস শালা? সিদিন সাতকাহন গপ্প বললি নে।

সে তো [illegible] গো।

সাহেবে-ভূতে ফারাক কি! গপ্প গপ্পই।

তাও ত বটে!

সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাহলে সবটা সত্যি নয়। হলেও ওদের কি?

আসুক মোছরমান, আসুক গোরা-কালা, আদার উশুলে ত আর ভেনারা আসতিছে না, সে দায় পইছে মান্যি-গন্যি শেখের পতেরা, মশায়রা।

হ, ভেনাদের কিনে নিয়েছে।

তাহলি—

হ্যাঁ হ্যাঁ, আদায় ব্যাপারীর জাহাজের খপরে দরকার নাই। শোন গে বাবারা, ছাড় তালা। তালের আসরে ঢুলোর কেত্তন থাক, তালের কেত্তন ধর।

ঝাঁ ঝাঁ শব্দে কাঁসা বেজে ওঠে। টিম্ টিমাটিম্ ঢোল। জোকার দেয় বউ-ঝিরা। উল্‌লু লু। তালে তালে হাত তালির শব্দ ওঠে।

বার উঠোনে ভালের আসর। লক্ষ্য ফোঁড় দেয়া। হালের ভাষায় টিকে। সেকেলে মায়ের দয়া হয়েছে তেমন গরুর অঙ্গে বেরোনো গুটি থেকে বীজ নিয়ে মাস ছ'মাসের, বছর দুবছরের ছেলে-পুলের শরীরে ফোঁড় দেয়া হত। মায়ের দয়ার হাত এড়িয়ে বাঁচবে, হলেও ঝাড়ে-বংশে উচ্ছন্নে যাবে না, টিকে যাবে—ও জন্যেই টিকে। তার জন্যে উদ্যুগ আয়োজন কত্তো, ফুল বিল্বপত্র, নৈবিদ্যি-সিধে, যাগ-যজ্ঞি, নাচনা-গাওনা—

সে এক ইলাহী কাণ্ড গো! মরণ ঠেকান বলে কথা!

তা বাপু তোমরা হলে গিয়ে শুদ্দুর, ডাল-ফাল নিষ্যাত পুজো-পাব্বন।

আজ্ঞে, হিসেবে ধরলি এ একরকম পুজোই। এলাকাটা মা শেতলার কিনা! মন্তর -টন্তর অনেক, হ্রীং ক্লীংও কম না। তবে হ্যাঁ, পৈতেওয়ালা বাওন লাগে না এই যা। তাছাড়া আজ্ঞে, ভোগান্তিও এক ডাই। বাওনরা আজ্ঞে কলা-চালের হিস্যেটা বোঝেন, ঢং বং বলি ফুল ছিটোনোর দায়টা বোঝেন, বাঁধা-ছাঁদার কায়দা বোঝেন। কিন্তু আজ্ঞে ফোঁড় দিলে চেতবে, চেতলে জরজ্বারী, উঁকি-টুকি, প্রলাপ-টলাপ, এতাল-বেতাল অতসব ওদের ধাতে সইবি কেন? তখন ঝক্কি বলে ঝক্কি। বীজের তাপে গুটি বেবোল ত আর কথাই নাই। তখন ক্ষণে ক্ষণে ঝাড়ফুঁক, মন্তর-টন্তর। দাও সোনাপাতা-রূপোপাতার গুঁড়ো, কাঁটানটের শেকড়ের রস। যদি চাপা থাকে, তেমন তেমন না বেরোয়, দাও মেথি ভেজান জল, কাঁচা দুধ,—মায়ের দয়া বলে কথা! কি যে নেয়, ঠিক কি! চোখ নিতে পারে, শরীলের ছিরি, এমনকি জানটাও। তখন কতো দিব্যি শেতলার। দিক বাঁধো, গণ্ডী আঁকো, ঘরের চৌহদ্দি সাফসুতরো কর। অশুদ্ধ, অশুচি, বাসি কাপড়ের মানুষজন পাশ মাড়াবে না গো! ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে।

দাও ধুপধুনা, ঘটি ভরে রাখো সোনারুপোর জল, ঘুনি (মশারী) খাটিয়ে ভেতরে রাখো রোগীকে, আমের ডগা ডুবিয়ে সোনা রূপোর জলের ছিটে দাও জনে জনে, এমন কি বার ফেরৎ বদ্যিকেও। বড় শুদ্ধসত্ব কাজ আজ্ঞে। এট্টু বেচাল হয়েছে কি জান নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি। এ বলে ইদিকে ত, ও বলে ওদিকে। মশাই, এ পুজোপাব্বনেরও বাড়া। বাওনের সাধ্যি কি পৈতের জোরে ঠেকায়? তা আজ্ঞে, নাইবা হলাম পৈতের গলায় বাওন, বদ্যি ত বটেক্!

o

তা বৈদ্যি বটে। ভুবন বদ্যি। নাম ভুবন জোড়া। ভুবন বলতে আশপাশের গাঁ-গেরাম—এই আর কি! তা দোষের মধ্যে নেশাবু। গাঁজা, ভাঙ্, আফিম, চণ্ডু, চরস, এমন কি ধুতরোর বিড়ি—কোনটাতে না নেই। ভালের মুখে আরো বেশী। তখন জোস্ কি! রইল পড়ে ঘর-সংসার, মাগ-ছেলে; সে দিনের পর দিন। কেউ শুধলে বলে, ওরা আজ্ঞে আছে, রইল।

বেচে বর্তে আছে ত?

ত্য-আর নাই,। নিষ্যাত আছে। মরলি ঠিকই খপর হত, কি বলেন ?

তা ঘরে খুদ-কুড়োর জোগাড় আছে ?

এ কি আজ্ঞে বোঝদারের মতন কথা হল ? আপনি বলেন, না থাকলি জোগাড় করবে। ওদেরও ত আজ্ঞে হাত-পা আছে, মাথা আছে, খিদে আছে—কি ঠিক বলি নাই ? তা এত সব যখন আছে তখন নিষ্যাত জোগাড়েরও কায়দা আছে। মানুষের কি আজ্ঞে পরের দিকে তাকিয়ে থাকলি চলে ? তাছাড়া—

কি ?

সব দায় আজ্ঞে সোয়ামী-বাপের, ঠিক না।

বটে! বটে! মাগ-ছেলে তোমার, দায় পুইবে বুঝি হবিব বেটা ?

কথাটা ঠিক বলিছেন বটে। তবে কিনা সংসারের সুখ ত আর আজ্ঞে এক তরফা না।

বলি, বিয়েটা তুমিই করেছ, নাকি ?

এত বড় সমিস্যায় ফেললেন গো। বদ্যি কথা ঘোরায়। ওসব ছেড়ে দিন আজ্ঞে। মাথায় ঠিক খেলাতিছে না। কেমন যেন। আসল কথা কি জানেন, আমার এখন মরার ফুরসৎ নাই। মাথার 'পরে যম শুকুন হয়ে পাখ সাপটাচ্ছে, আমি বলে—ওরে যে কক্কেটা ঝাড়া, সুখটান দে ঝেঁপে পড়ি।

ওদিকে বাড়ীর ভেত্তর হুলুস্থুলু। কি যেন কি।

কি হল গো ? অতো আওয়াজ কেন ?

খোকা কেমন করতিছে।

ওহো! ও গরমের ছটফটি, ও কিছু না। সবে শুরু গো, ভয় নাই। বলগে, মাথার 'পরে মা শেতলা রয়েছেন, ভুঁয়ে তার চেলা ভুবন বদ্যি। ডর কাকে ?

বদ্যির এই দিক কাঁপানো সাহস-ই ভরসা।

শুধু ফোঁড়ের বদ্যি হলে না হক কথা ছিল। ভুবনের আবার এদিক-সেদিক আছে। বশীকরণ, ভূত তাড়ানো, গাছ চিরে গাছ জোড়া। জানত অনেক কিছু—ঝাড় ফুঁক, ডাকিনী মন্ত্র, পিশাচতন্ত্র, আগড়োম-বাগড়োম কত কি। ওই-ই কাল হল।

লোকে বলে, ভূতো বদ্যির ঝাড়ে-বংশে উচ্ছন্নে যায়। ভিটেয় বাতি জ্বালানোর কেউ থাকে না।

বটে! বটে! বদ্যি মাথা নাড়ে—ও রটা কথা।

আজ্ঞে, ঘটে বলেই রটে। মানুষ ত আর না বুঝি-শুনি, না দেখি-ঠেকি অমনি অমনি বলে না।

বদ্যি হো হো শব্দে হাসে। বলে, মানুষের কথার ছাড়ান দাও। কি থিকা যে কি বিশ্বেস করে তার ঠিক কি আছে ? সত্যি যদি কই, মানুষের ঠিক ঠিক দিশা পাওয়াই শক্ত। মানুষ হল গিয়ে দু পেয়ে—

তাপ্রথম বউ বাঁজাই মরল। পরের বউ মেয়ে বিয়োতে। সেই গাধাকী অপয়া মেয়েটা মরল দু'মাসের মাথায়।

অ ভুবন! রটা কথা যে ফলি যায় গো!

তবে রে—

ন্যাঁড়া তিনবারের বার কলাতলায় গেল। তখনকার কালে এ নস্যি। দশ বিশ বারও কারো কারো। মেয়েমানুষের ত অভাব ছিল না।

তৃতীয় পক্ষের এক ছেলে। আছে, বেঁচেবর্তে আছে। দিনে দিনে বাড়ছে গারে-গতরে। আর কিছু হওয়ার নামটি নেই।

আরো চাই? আবার বসো। বলো ত যুৎসই মেয়ে মানুষের খপর কবি।

না বাপ, ছাড়ান দাও। ঘরে সতীন কোঁদলে কাজ নাই। ঢের হয়িছে।

নতুন কথা শুনি যে বাঁদ্য। বলি, ঘরে ঘরে যার চলন—

আমার ঘরে চলবে নাই।

তা বলি সাকুল্যে এক ছেলের বাপ?

আমার ওই একে চন্দর। ওই একাই একশ। আর তেতে কাজ নাই হে! নিজের বলতি দেহখান ছাড়া আছে কি কও? তাও—

কথাটা ভুবনের পক্ষে সত্যি। জোত-জমি বলতে কিছু নেই। থাকার মধ্যে ওই এক চিলতে ভিটে, তাও বন্দোবস্তীব। দিনকাল যে খুব খারাপ তা না, কিন্তু কপালের গেরো। দু' দুটো মুখের ঠিক ঠিক জোগান দেবে সে মুরোদও নেই। ডালের পাওনা সেই গাওনার নেশা ভাঙে, চেলাদের ভাগবাটোয়ারায় ফুরোয়। থাকে সিধের চাল-ডাল-মুলো-কলা। সে আর কদিন! সংসার না চলার মতো টিকির টিকির চলে। একে তৃতীয় পক্ষের বউ, যেমন রঙ, তেমনি গড়ন। বয়েসী ত বটেই, নইলে অভাবী তেজ বরে কেউ মেয়ে দেয়? তদুপরি যেমন বদরাগী, তেমনি মুখের বাক্যি। কলকলিতে দি ঢাকে।

অবশ্যি বউ যে একেবারে অবুঝ, তা না। তবু

মিনসের নেশা ভাঙের ভূত ঘাড়ে, মুখ করলেই ঝেড়ে ফেলবে তার জো কি! যেই না জোর করে ছাড়াব অমনি ডাঁটো মানুষটি নিতিয়ে পড়বে, একুল-ওকুল দুকুল যাবে। তখন?

হ্যাঁ, বাপের আছে। সেখেনে ত হাত পাতার ক্ষান্তি নাই। কিন্তু কত আর নিবে? ভাই আছে না, মা? তার চে যেমন চলতিছে চলুক। বয়েস কালের অদেষ্টর গেরো, ওকি আর অমনি অমনি কাটে! বিয়েই কপালে ছিল নাই ত বিয়ের ফুল ফুটল। ছেলের মা। একি কম গা? এর জন্য ভোগান্তি এট্টু সইতে লাগবে। সইব। ওতে ত আর গায়ে-গতরে ফোস্কা পড়বে নি। ভয়?

থাক বুড়ো মিনসে তার মন্তর-টন্তর, নেশা-ভাঙ, ভূত-পেত্নি সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে। জ্বলুক, জ্বালাক। কিন্তু ছেলেটা যে বয়ে যায়। বলি, সে খেয়ালও কি থাকতি নাই?

খেয়াল ছিল, আছে। তার জন্য ত হাতে পায়ে ধরতে গিয়েছিল বড় মশায়ের। ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম করে বড় মিনতি করে বলেছিল ভুবন, একটি মাত্তর ছেলে। ছেলের মায়েরও বটে, আমারও বটে, বড় সাধ মশায়দের ইস্কুলে ছেলেটার এট্টু গতি করে দেন।

মশায় ত ভুবনের মিনতির রকম দেখে থ! বলে কি ভুবন? দিনে দিনে দেশের হালহকিকত কেমন পাল্টাচ্ছে দেখো! ভুবনেরও সাধ ছেলের পেটে বিদ্যে ঢালবে। তা'লে আমাদের গুলো যাবে কই?

মোসাহেবরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। সুধনের বেটা বুধন, মহাশয়দের কল্কে সাজায়, সে আরো সরেস। সেও কিনা দাঁত কেলিয়ে হাসে। ভুবনের পিত্তি চড়ে। তবু শেষবার হাত কচলাতে কচলাতে নিবেদন করলে, আজ্ঞে, আপনাদের পায়ের তলায় আছি, পায়ের তলায়ই থাকব, দয়া করি যদি—

যা যা, দিক করিস্ নে অবেলায়। কোথাও রাখালি জুটিয়ে দে পেটে ভাতে, ওতেই এ জন্ম বর্তে যাবে। তাছাড়া—

আজ্ঞে—

একটি পেটও কমবে।

কথাটা ভুবনের কানে লাগল। মশায় খুব মন্দ বলেনি ত! চাঁদ ধরার সাধ্যি কোথায় যে সাধ পুষবে। বউকে বলতেই বউ ঝাঁঝিয়ে উঠল।

লজ্জা করে না ও-কথা বলতি?

দেখো, দেখো, নেশা ভাঙে ক্ষয়া লোকের আবার লজ্জা! মরি! মরি! জানিস্ নে লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। অ বউ, ওই তিনটে সেই কবে খুইয়েছি তার কি ঠিক আছে?

মরণ! মরণ! গলায় দড়ি জোটে না? মাটির হাঁড়ি?

সুরু হল মাগীর ঢপ কেত্তন। বলি, থাকব না কাটব?

কাটো, কাটো। যাও যেখেনে মন মর্তি চায়। একটা ত পেট কমে, হাড় জুড়ায়। ওই যদি মুরাদ কে সেধেছিল বুড়ো বয়সে পিঁড়িয় বসাত?

এই কথা! তবে রে—

নিত্যদিন মুখফোঁড় মেয়ে মানুষের ঘেনর ঘেনর সয় কোন বেটা ছেলে? অতএব যেদিকে চোখ যায় সরে পড়ো।

০

সুদিনে, যখন জাঁক করা রোদ্দুর, তখন সত্যি সত্যি কেটে পড়ে। এখানে সেখানে ঠাঁইয়ের ত অভাব নেই। নেশাভাঙের মানুষ যত্রতত্র। মনের মতো মানুষটির সঙ্গে না পেলে নেশা জমবে কেন? তা রসিকে রসিক চেনে, চোরে চেনে চোর। এগোলেই ডাক। কিন্তু অ-দিনে? ভরা বাদলে?

সেবারে, খুদকুড়ো নিয়ে, সংসারের আরো দশ কথা নিয়ে সে কি ঝগড়া, ঝাল্লা। অত কথার তাতেও পা বাড়াল না ভুবন, এমন কি নড়ে চড়েও বসল না। চাদ্দিকে জল আর জল। বলতে গেলে উথালপাথাল বানভাসি। কলার মান্দাস বাঁধার জন্যেও ত গাছ লাগে। তা ভিটের কলা গাছের চিহ্নটিও নেই। কেঁচোয় কলার ঝাড়ের সব্বোনাশ ডেকেছে। এদিক সেদিক করার সাধ্যি কি। তেমন তাগিদ থাকলে কোমড়ে গামছা বেঁধে বুক জলে নামতে হয়। তা এ বয়সে সে তাগিদ! অতএব জলে ডোবে

ঘর, কুটোটি চেপে ধর। থাকো বসে, ঝিমোও সকাল-সন্ধ্যে। শোন বকুনি-ঝকুনি। কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো, কথায় কি আর গায়ে ফোস্কা পড়ে! পড়েও যদি—

জলে পাথার ডোবা। মেঘে আকাশ। দিকচিহ্ন খুঁজে নেবে সাধ্যি কি। তার উপরে সারাক্ষণ গুরু গুরু। ভূত-পিশাচ, পেত্নি-টেত্নি, মামদো-হুদো সব শালার দেশ ছাড়া। বদ্যিগিরি ফলাবে তার জো কি! সব শালা-শালী পগাড় পার। ভূত-পেত্নিরও ভয়-ডর আছে না কি! আর ডালের মরশুম? সে ত সেই শীতের মাঝা-মাঝি। এখন গুড়ুক-ফুড়ুক। তা সেই তামাকও বাড়ন্ত।

নাই বলতি কিছু নাই। বলি, ঘরে বসি কর কি? ভগবান হাত দিছেন, পা দিছেন, খিদে দিছেন—কিছু বলতি যাও ত অমনি তাড়কা রাক্কুসি।

এ কি বদ্যি! এ কি তোমার মুখি মানায়? অতো তেজ যদি ঝাড়ো তোমার মোক্ষম বশীকরণ। দেখবে এক ফুঁয়ে ঠাণ্ডা। ট্যাঁ ফুঁটি করবি তার—

বটে! বটে! শেষে মুড়ো ঝাঁটা জুটুক কপালে।

তা'লে কি বিদ্যে বাপু পেটে? অতো যে দাপট, হ্যাঁকড়-প্যাঁকড়—

ও আছে, রইল। ও বিদ্যে ঘরে ফলে না, ফলাতে নাই।

কেনে গো?

গুরুর মানা।

তা সেই ভরা বর্ষায় অঘটনটা ঘটল। একটা নৌকো এসে ভিড়ল উঠোনে। নিয়ে এসেছে ক্ষেত্তর। খোকার মার বাপের বাড়ীর পড়শী। সম্পর্কে ভাইও বটে। খুশীতে দিক ঢাকার আগে দুঃখু ঘর জুড়ল। আহা রে কান্না!

গেছে শালা-শ্বশুর এক রাত্তিরের ওলাউঠোয়। এখন মরা পাহারা দিচ্ছে শাশুড়ী। হায় রে! জল-ঝড়ের দিনে এমন আহেলা সব্বনাশ। হা ঈশ্বর!

শাশুড়ীর এখন থাকার মধ্যে এই মেয়ে-জামাই-নাতি। অতএব—নেংটী পোঁদ ছেলেকে বউয়ের শাড়ী জড়িয়ে টুকিটাকি জিনিস পত্তর নিয়ে নৌকোয় চাপল ভুবন। হাঁকলে, নে, তাড়িঘড়ি নে। আগে ত মরার মুখে আগুন দি। মড়া ত বাসি হল বলে—

কাঁদতে কাঁদতে কাঁথাকানি, বাসন-পত্তর, আণ্ডিল-বাণ্ডিল গুছোচ্ছিল। বললে, তা বলি গুছুতি হবে নি? যদি ফিরার আগে জলে ঘর ধ্বসে!

দেখো, দেখো, এতো শোক তাপের মধ্যিও হিসেব দেখো। এ না হলি মেয়ে মানুষ! মনে মনে বললে ভুবন।

ফলে, সব গুছিয়ে তুলে নৌকো ছাড়ল। ঘরে বসে থাকার দুঃখ ঘুচল ভুবনের। দু' দু'টি মরণের খবরে হা-হুতাশী দুঃখ হতো, ঠাঁই বদলে, তদুপরি শাশুড়ির একমাত্র সম্বল মেয়ে-জামাই-নাতি,—এ খবরে, এক বুক শোক-তাপের মধ্যেও টানটান সুখ পলকে উঁকিঝুঁকি মারলে। ভুবন মনকে বললে, ছিঃ! তা ছিঃ কি সুবাই পারে মাগো? মন তাড়াতে চায় তব চেপে বসে।

মন বললে, অ ভুবন ! তোর দিন কয়েকের অভাব-তাপের দায় ঘুচল। চাই কি—
দূর ! দূর !
সেই সুখে, হয়ত বা পেঁছনোর তাড়ায় আগ গলুয়ের আড়ায় বসে দাঁড় ধরলে ভুবন।

O

সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। এ ভিটের আর ফিরতে হয়নি।

O

দাহটাহ শেষ হলে তিন দিনের দিন শুচি হল জামাই। তারপরে একাদশী, তিরিশ দিনে শ্রাদ্ধ, ভুঁর ভোজন, মাছছোঁয়া। সব কাজ মোটামুটি সাঙ্গ হলে—
এবার যে যেতি লাগে।
যাবে কি ! তাহলি এ নাও, জমি-জিরেত, ভিটে বাড়ী—বাপ্‌ আমার, তোমরা ছাড়া আমার আছেটা কে ? ভগমান যে আমারে—ডুকরে কেঁদে উঠল।
কিন্তু এত্ত সব সামাল দিব তার সাধ্যি কি ! আমি হলাম গিয়ে—
জানা কথা ফিরা বলি কাজ নাই বাপ্‌। মন না চায় বেচি দাও।
তা আপনের চলবি কিসে ? দ'মুঠো গিলতি হবে নাকি !
শেষ পর্যন্ত অনেক শলাপরামর্শ, অনেক ব্‌ঝবাজ হলে সাব্যস্ত হল, পাকাপাকি থেকেই যাবে।
কিন্তুক—
ও কিচ্ছু না বাপ্‌। নেশাভাঙ ত মানুষিই করে। যে ধরে, সে ছাড়তিও পারে।
পারে কি ?
মান্‌ষিই সব পারে বাপ্‌। আর কোন কিন্তুক নাই।

O

চাষের জমি ভাগে দিয়ে, ভিটে-বাড়ীর তদারকী বউ-শাশুড়ীর ঘাড়ে চাপিয়ে মাস কয়েকে বাদ্যি মাঝি হয়ে গেল। পেশার বদলে ডাকেরও বদল হয়ে গেল। ভুবন বাদ্যি হল ভুবন মাঝি। সেকালের সে রীত।
গতরে না খাটা, নেশাভাঙে ক্ষয় ধরা শরীরেও দিনে দিনে সব সয়ে এল। ভুবনের বিশ্বাস হল শরীরের নাম সত্যাই মহাশয়। নেশা-ভাঙ মাথায়। দায় বলে কথা। তদ্‌পরি হাতে নগদ পয়সা।
আসলে শ্বশুর ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপিছে। মাথা তুলি সাধ্যি কি ! কেরায়া-সওদার ঝঞ্ঝাট মিটলি পরে গতরে আর দম বলি কিছু থাকে নাই। তখন সাধ যায় মরার মতন চিৎ হয়ে ঘুমাই।
তা খাটো, খাও, ঘুমাও—কে দিক করছে ?
আজ্ঞে তা ঠিক। আর খাকলি—

O

ক্রমে ভুবনের নাম ডাক এলাকা জুড়ে। লোকে বলে, বাদ্যি মাঝি ত !, মন্তরে নাও চলে। ঠিক যেন বশীকরণ করিছে। -
ধুস ! ধুস ! সবেগে মাথা নাড়ে ভুবন। তাহা মিছা গো। নাও চলে সাহসে। মন্তর-

টন্তব সব ভুয়া। ওতে না দেখা ভূত-পেত্নী টলে বটে, নাও চলে না। নাও চলে আজ্ঞে হালে, দাঁড়ে, পালে, গুণে।

O

ভুবনের ছেলের নাম ধনা।

ধনা, ধনা, ধনা—আমার ঘরের সোনা—

ও ত ডাক নাম গো! ভাল নাম কি ছিল?

তাই ত! কি ছিল?

ভুবন আঁতিপাঁতি হাতড়ায়। এককালের নেশা-ভাঙ, মন্তর-টন্তরের মানুষ, হালে দিন-রাত্তিব গতব খাটানোর ঝামেলায় অত শত কি মনে থাকে? না, রাখা যায়? তা, ভাই তোমরাই ঠিক করি দাও। হয়ত ধনারাম ছিল, নয়ত ধনশ্যাম—

ধনঞ্জয় নয় তো? সোয়ারীদের একজনা শুধোয়।

বা রে! অতো ভারী নাম। মাঝির ছেলে বইতি পারবি ত? আরেকজনা ফোড়ন দেয়।

তা বাপু, বাপ্ যখন বদ্যি হয়েও নাও বাইতি পারছে, ছেলে ওই টুকুন নাম বইতি পারবে নি?

তাও ত বটে! লাখ কথার এক কথা।

হ্যাঁ গা মাঝি, ধনপতি নয় ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেলের নাম আজ্ঞা ধনপতিই বটে!

আহারে! কানার নাম পদ্মলোচন। সোয়ারীদের একজনার ঠেস্।

আজ্ঞে, তাই ত বটে। তবে ছেলের মায়ের সাধ-আহ্লাদ, বাধা দিব সাধ্যি কি!

তা বলি গরিব মাঝির ছেলের নাম ধনপতি—বড় কানে লাগে। ওসব বড় ঘরে—

এ বাপু অন্যায্য কথা। ধন নাই বলি কি সাধও থাকতি নাই? স্বপন দেখতে কি পয়সা লাগে? ভুবনের গলা চড়ে।

আহা! রাগো কেনে?

আজ্ঞে, রাগের কথা না। আপনারাই বলেন, বদ্যি যদি মাঝি হতি পারে, মাঝির ছেলের সওদাগর হতি বাধবি কেনে? আজ্ঞা, মানুষই ত সদাগর হয়, না কি?

সে ত! সে ত!

O

তখন ভুবন মাঝির স্বপ্ন ছিল না। ইদানীং দেখে।

আজ্ঞা, মাটি থাকলি ত গাছ।

ভুবন মাঝি স্বপ্ন দেখে তার নৌকো একদিন বড় ডিঙা হয়ে গেছে। এক দাঁড়ি নৌকা হয়েছে পঞ্চাশ দাঁড়ি। পাল জুড়েছে আকাশ। মাস্তুলে বিঁধছে সুয্যি-চন্দর। ঘড়ি ঘড়ি ঢেউ ভাঙছে পাটাতনে। শব্দ উঠছে ছলাৎ-ছল।

কে যায়? কার ডিঙা?

আজ্ঞা—

কার ডিঙা?

ভুবন মাঝি থতমত খায়। কি বলবে ?
বলি, কার ডিঙা ?
আজ্ঞা ধনপতির।
ধনপতির ডিঙা ছুটছে মাঝ দরিয়া চিরে। মাথার 'পরে নীল চাঁদোয়া সাজিয়েছে আকাশ, চৌদিকে মেঘেরা টানটান খাড়া দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকছে, চুরাশি পবন ঠেলছে ডিঙা, দ'াড় পড়ছে ঝপাৎ ঝপ্, হালে বসে ধনা হ'াকছে, ভাইরা হ'ুশিয়ার।

দেশ ঢু'ড়ে মনপসন্দ মাল বয়ে নিয়ে বিদেশ থেকে ক'াড়ি কাঁড়ি সোনা-রূপা, মোহর-কড়ি, মনিমুক্তো নিয়ে ফিরবে। দাপটে কাঁপবে দেশ গ'া। মানুষজনে দেখবে ভুবন মাঝির এক চন্দ্রে দেশ আলো হয়ে গিয়েছে। ধনা হয়েছে ধনপতি। তুচ্ছ মাঝির ছেলে কিনা ডাকাবুকো সওদাগর।
ও মাঝি ! নাওয়ের চলন ব'াকা ঠেকতিছে যে ?
হ বাপ্, মনটা ঘোরে ছিল, আর হবে নাই।
তবু ভুবন মাঝি মাঝে মাঝে বেহাল হয়। ভাবে আর ভাবে। আমার বেলা যে হেলে গো !

o

ভুবনের বাপের শেষ বয়সে এমন কিছু ছিল না যে দশে গ্রাহ্য করবে। নামডাক সেই কবে গেছে, নামের ভুরভুরিও। তদুপরি ভিটেটাও ছিল মহাশয়দের হাতে পায়ে ধরে বন্দোবস্তী নেয়া। সব খুইয়ে তখন ভিখিরীরও বাড়া। হাত পেতে যে নেয় তাকে আর গ্রাহ্যি করে কে ? কিন্তু শ্বশুরের গ'ায়ে শ্বশুরের নাম ডাক আছে, ইজ্জত। তাছাড়া ভুবন ত আর ঘরজামাই নয়, উত্তরাধিকারে ভোগদখলী। অতএব—

শ্বশুর বাড়ীতে গ'্যাট হয়ে বসতেই বউ ছেলের হাতে খড়ি দিলে। শাশুড়ী বউয়ের উদ্যুগে রসময় মাষ্টারের খেরো খাতায় নাম উঠলে। ব'াশ কাঁঠির কলম, ঝুলে তৈরী কালি আর কলাপাতা হাতে পে'ৗছে দিলে। বয়েস হয়েছে ছেলের, মা-দিদিমার তাড়া, ছেলেরও ইচ্ছে, সড়গড় হল দুনো বেগে।

বছর চার গড়ালে, তখন ছেলে তেরোয়, মাঝি শুধলে, নাম লেখা আসে বাপ ?
ধনা মাথা নাড়ে।
গোনা-গুনতি ?
হ'্যা গো।
নামতা ?
তাও সড়গড়।
যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ?
ধনা এক গাল হেসে জানায়, সেও।
মানসাঙ্ক, শুভঙ্করী ?
হ'া রে বাপ, সেও।
তা'হলি হালে বস।

ছেলে এক কথায় রাজী। বাপের কথা বলে কথা। কিন্তু মা-দিদিমা আকাশ থেকে পড়ে।

সে কি কথা গো। আরেট্টু সড়গড়ি হ'ক।

ধনার মা, আরো সড়গড়িতে কাজ নাই। যা হয়িছে এই-ই ঢের। এতেই করা-কম্ম চলবি, আদায়-পত্তর।

তা'বলি—

বেশি বিদ্যেয় পাখা গজায় গো। গতরে খাটতি মন চায় না। দম নিয়ে বলে, নিজের কপাল নিজে পুড়িছি। বদ সঙ্গে নেশা ধরি এ বয়সেই দম যায়। হাল ধরি হাল কাঁপে। তাছাড়া আমার বাঁচন চাস্ ত ছেলের লেখাপড়ার মায়া ছাড়। মরার আগে যা জানি বুঝি শিখায়া দিই। ধনার মা, দুনিয়াটা বড় কঠিন ঠাঁই। যদি হঠাৎ—

ষাট্! ষাট্! একি কথার রকম গো।

তা'লি কথা দে ছেলেব পড়ান ক্ষান্তি দিবি। আমার কথা রাখ, কথা দিলাম, ধনা আমার জীবন ভর কেরায়া বইবি না, সে সওদা করবি।

কি-ই! অত্ত সব সে পারবি কেনে? ওই একরত্তি ছেলে—

আমি আছি না। তার বাপ্।

০

কথায় আছে, ইচ্ছে থাকলে হয়। ধনারও হল। মাস দুয়েকের মধ্যে দাঁড় থেকে হালে।

ভুবন এখন দাঁড়ে বসে। ছেলের হাতে হাল। যেদিকে চালাবে সেদিকে চলবে। কিন্তু—

এ্যাই, কোথা নিয়া চললি নাও?

একবার বড় গাঙে বাপ।

সে কি! সে কি! দাঁড় হাতে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায় ভুবন। ছোট্ট নাও, খাঁড়ির মুখে পালট খায় যদি?

বাহ্, তুমি আছ না!

আহা রে পুত্ত আমার! বাপের 'পরে তোর অত্তই যদি ভরসা তয় শোন, জীবনটা আমার ইতি উতি গেল। সুরুতে বেদিশে ছিল, যখন দিশে হল তখন ভাটির টান লাগিছে শরীরে। ইচ্ছে থাকলিও হল নাই। তোকে কিন্তু বাপ সাগর পাড়ি দিতে হবে। নাও নিয়া নয়, ডিঙা নিয়া। এ আমার স্বপন বল স্বপন, সাধ বল সাধ, এ তোরে পুরণ করতিই হবে। শুনছিস, এখন বাপ খাঁড়ি বাঁচা। ঢেউয়ের মার দেখ, ঝাপটের তোড়। নিঘ্যাত জোয়ার আসতিছে। দেখিস্, হাল ছাড়বি নাই, শক্ত মুঠায় চাপি ধর।

ভুবন মাঝি মরিয়া দাঁড় টানে। টানতে টানতে বলে, ডর লাগে ত হাঁক দিস্।

খাঁড়ি ডিঙিয়ে এট্টু ভেতর গাঙে এক চক্কর ঘুরে এল বাপে পুতে। ফিরে ছোট গাঙে পড়তেই খুশিতে হাঁক দিলে মাঝি, হেইরে বাপ, তুই তোর বাপেরে ডিঙোলি।

কিছুই যে সুখ দিলি কি কই। তোর হতি হবে বাপে, নিশ্চয়ই হতি হবে। সাহস রাখিস, ওই-ই লক্ষ্মী। ও যার আছে তার সবই আছে। এই দিন-দুনিয়া তার। বাপ আমার, সাহসের লাখান আর কিচ্ছু নারে, কিচ্ছু না।

o

সেই-ই শুরু ॥

২

মাসটা চৈত্রের শেষ। খরার দাপানি-তাপানি সুরু হয়েছে সে মাসের পয়লা থেকে। মাঝে মাঝে দখিনা বয় না তা নয়। কিন্তু খরার দাপ-তাপ তাকেও ছাড়িয়ে।
গঞ্জের ঘাটে নৌকো বেঁধে ভুবন গেছে মহাজনের গদীতে, যদি চাল-ডালের কোন চালান থাকে।

o

হাটুরে পাইকারদের কাঁচা আনাজ-পাতি গুছিয়ে রাখার কথা ছেলেকে বলে গেছে। আগে বাপ আলু-পেঁয়াজ-কুমড়ো, তারপরে বেগুন-মূলো-শাঁকের আঁটি, কলার কাঁদি উপরে, ধারে মান। ডাবের কাঁদি পাছ গলুয়ে, মানুষ-জন বুঝে সুঝে। যেতে যেতে হেঁকে বলেছে, এই গেলাম কি এলাম। ফিরে যেন মালপত্তর পাল্টাতি না হয়। ও হ্যাঁ, নুনের বোরা মাঝ নায়ে পর পর থুবি।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি কিন্তুক তাড়াতাড়ি ফির, আবার যেন গপ্প—
ততক্ষণে ভুবন দ্রুত পা চালিয়ে গঞ্জের গলিতে মিলিয়ে গেছে।

o

হাটুরে পাইকারদের সঙ্গে হাতাহাতি মালপত্তর গুছনো হয়ে গেলে ঘেটো ছাউনীর নীচে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলে ধনা, মোল্লাখালী, রামধনীর হাট, নীলগঞ্জ, সুখচর……
হঠাৎ দমকা হাওয়া। চমকে ঘাড় তুলতেই, এ কী!
ঈশানের আকাশে জুড়ে মেঘ। পলকে পলকে শরীর বাড়ছে। যদ্দূর চোখ যায়, জল আঁধার করা ঘন কালো মেঘ যেন হা হা করে আকাশ গিলছে। ক্ষণকয়েকে আলো ঘুচল, বাতাস ডাকছে। এই বুঝি নদী মাতাল হল। শোঁ শোঁ ও……
ধনা পড়ি মরি নৌকোর কাছে ছুটে গেল হাঁকতে হাঁকতে, দেখতিছেন কি, হাত লাগান গো ভালমানুষেরা, ঢেউয়ের তোড়ে যে—
তা মানুষ মানেই দু'পেয়ে জানোয়ার নয়, অপোগণ্ড নয়, মানুষ মানে হদ্দ বজ্জাতের ঝাড় নয়, অমানুষ নয়—
অনেকেই আগ বাড়িয়ে হাত লাগালে। মালপত্তর হাতে হাতে উঠে এল পাড়ে। নৌকো ঠেলে তোলা হল ডাঙায়। ঢেউ দাপাচ্ছে, থামছে খুবলে নিতে চাইছে

পাড়ের মাটি।
ভাগ্যিস্, আকাশে চোখ থুয়েছিলাম, নইলে—
০
ভুবন ওই ঝোড়ো উথালি-পাথালির মধ্যে পড়ি মরি ছুটে এসেছে। ভাবখানা এই, ছেলে যদি মাল-পত্তর, নৌকো না সামলে থাকে। ওমা! আগেভাগে সব সারা। ভুবনের মন খুশিতে উঠাপড়া করে। মনে মনে বুক বাজায়, নাহ্, ছেলের আক্কেল-গমি্য আছে, বুদ্ধি-সুদ্ধি। দেখতি হবে নাই কার বেটা! সেই খুশির ভাব আড়াল করে ভয় ধরা গলায় বললে, বড্ড ঠেকিয়ে দিলে যে দেয়া। এখন ?
ধুলো উড়ে আসছে, কুটোকাটা। চোখ মেলে তাকায় সাধ্যি কি! ওরই মধ্যে বাপ-পুত্তে নৌকোর ছই এনে মালপত্তরের উপর চাপিয়ে দিলে। কলা-মূলো-কুমড়োর কিছু হবে না, কিন্তু নুন-আলু-পেঁয়াজ—
ছড়ানো ছিটনো লোকজনেরা অনেক আগেই গঞ্জের ছাউনির তলায় ঠাঁই করে নিয়েছে। ধনা বললে, তুমি ছাউনির তলে যাও, আমি আছি।
সে কি রে! তুই ছই ঠেকাতি পারবি কেনে ? তুই যা, আমি আছি।
তুমি ? ধনা ভুবনের দিকে তাকায়। কেমন যেন কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, শিরা বেরিয়ে পড়েছে হাতের পায়ের, বুকের হাড়-পাঁজরাও ; চোখ জোড়া গর্তে—তার চে—
কি-ই ?
ডাবগুলান ছইয়ের 'পরে চাপান দাও হাত্তাহাতি, চলো দুজনে।
মন্দ বুদ্ধি নয়। ঝড়ের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা—। মনে মনে ছেলের তারিফ করতে করতে ডাবের কাঁদিগুলো ছইয়ের 'পরে চাপিয়ে পড়িমরি গঞ্জের ছাউনির তলায় ঠাঁই নিলে।
দিক ডাকছে মেঘ, কড়াৎ কড় বাজ চিরছে আকাশ। বুঝি আকাশ ভেঙে পড়বে মাথায়। পাড়ের গাছ-গাছালি উথাল-পাথাল। গঞ্জই কি উড়ে পুড়ে যাবে ? হা ঈশ্বর!
বাতাসের তেজ এত যে চোখ মেলে সাধ্য কি! আগুন ছলকাচ্ছে যেন! আকাশও পলকে পলকে রাঙা হচ্ছে। গাঙ গজরাচ্ছে। দুনিয়াই বুঝি রসাতলে যাবে! গোঁ গোঁ ও......
বাপ গো, নাও যে গাঙের হাতায়। যদি টানি নেয়।
নিলে নিবে। কি করতি পারি ক'।
সে কি! ঝড়ের মধ্যে ছুটে যাচ্ছিল ধনা, ভুবন ঝটিতি হাত ধরলে, যাস্ কৈ ?
নাও যদি—
আহা রে পুত! তোর দুখ-দরদ বুঝি। কিন্তু পেল্লায় প্রেলয় ঠেকাবি সাধ্যি কি। মুখে বললে, থো তোর নাও, আগে ত জান বাঁচুক।
কিন্তু নাও—
জানই যদি যায় ত নাও ধুয়ে খাবি ? কে বাইবি নাও ? কে নিবে কেরায়া ?
সত্যিই তো! জানে বাঁচলে, বাপের নাম।
ঝড়ের দাপট দাঁতে কুটো চেপে সহ্য করে। ভিড়ের ভিতর নিজেদের গুঁজে দিয়ে থ মেরে থাকে। এক সময়ে দেয়ার দাপট থামে, হাওয়ারও। নামে অঝোরঝরণ জল।

এরই মধ্যে একবার ধনা বাপকে শুধিয়েছে, ছই নিঘ্যাত উড়ি গেছে, নয় ?
গেলে যাক্।
নুনের বস্তা ?
দিন-দুনিয়া ভাসে ত নুন !
যদি—
রাখ তোর যদি। দেয়া ডাকতিছে, আকাশ ভাঙ্‌তিছে, বাপ আমার ধয্যি ধর।
কিন্তুক—
বড্ড বকাস্ তুই। রহ্, দেখ, সব্বোক্ষণ কি আর সমান যায় রে।

o

ঝড় জল একেবারে থামল দেড়পহর রাতে। তছনছ হয়ে গেছে গঞ্জ, হাট-বাট, চালা-ছাউনি। যদ্দুর খবর মানুষ মরেছে তিন তিনটে। কানা খোঁড়া হয়েছে কয়েক গণ্ডা। চাদ্দিকে হাহাকার।

o

ডাবগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে ওখানে। ছই দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে গঞ্জের এক ছাউনির তলায়। শাঁকের আঁটি কোথায় গড়িয়ে গেছে কে জানে। চুপসে গেছে নুনের বস্তা। বেগুনের বোরাগুলো দূরে দূরে। নৌকো জলে যায়নি বটে, কিন্তু উল্টে গেছে। ভেঙেছে উনুন, মালসা, কুঁজো। সানকী, ঘটি, কুপি, হাতার চিহ্নটি নেই।
নৌকো খাড়া করে জলে নামিয়ে না খোয়ানো মালপত্তর গুছিয়ে তুলতে মাঝ রাত্তির পার। এতক্ষণ মাল গুছোনোর ধকলে খিদের কথা খেয়াল ছিল না। কাজ প্রায় গুছনো হতে পেট ডাকলে।
একবার হাট ঢুঁড়ে আসি, যদি কিছু মেলে—ভুবন অন্ধকারে পা বাড়াল।

o

সেই দুপুরে দুমুঠো পেটে পড়েছে। মাল জড়ো হয়েছে সারা ভাঙা বেলায়। সময় মতো রওনা দিলে এতক্ষণে শিবার টেক, মোল্লাখালী, রামধনীর হাট, সুখচর, সুলতানপুর পেরিয়ে যেত। এমন কি আউরখিলও। আর গিয়েছে! এই রাত্তিরে কেউ নৌকো ছাড়বে না। এখন ভোর তক্ ঠায় শুয়ে বসে থাকা। তাছাড়া সোয়ারীরাও বেপাত্তা। কে কোথায় ঠাঁই নিয়েছে কে জানে! ধনা ফতুয়ার উপরে কোমড়ের গামছা খুলে জড়িয়ে নিয়েছে। ঠাণ্ডা হাড় ছুঁচ্ছে। কে জানে এই রাত্তিরে বাপ কিছু পায় কিনা! না পেলে—
পেট গোলাচ্ছে, গোলাক। আঁধারে মালপত্তর সামনে রেখে ঠায় বসে ধনা। থেকে থেকে আকাশের তারা ঢেকে মেঘ ছুটছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাতাস থেমে থেমে জোরে বইছে, ফলে, হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠছে।
আশেপাশের, দূরের নৌকোগুলোর কুপির চিহ্নও নেই। মানুষ জনের সাড়াও না। এক সময়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজল ধনা। ঝিমুনি ধরার আগেই আলতো দাঁড়ের শব্দ। এত রাত্তিরে কারা? মুখ তুলতেই সব্বোনাশ, ও কি! দাঁড়ে হাত দিতে যাবে ওরা দাঁড় চেপে ধরলে। বললে, টঁ্যা-ফুঁটি করবি কি—

থরহরি কাঁপছিল গা, চোখ জলছিল রাগে ক্ষোভে, চেষ্টা করছিল খাড়া হবার, সব ব্থা গেল। নৌকো লাগিয়ে চটপট মাল তুলে নিল হাতাহাতি। নড়াচড়া করতেও পারেনি। বাজ পড়া মানুষের মতো নিথর বসেছিল গলুয়ের উপর।
বাপ যখন ডাকলে, যখন পায়ে পায়ে নদীর পাড়ে, ডুকরে কেঁদে উঠল ধনা, সব্বোনাশ হয়ে গেছে।
কী-ই! হাত থেকে খসে পড়েছে খাবারের ঠোঙা, বসে পড়েছে পাড়ের কাদায়। ধনা রে—
হ্যাঁ রে বাপ, ঠেকাতি পারি নাই। ওরা অনেক ছিল যে। সাধ্যি কি ঠেকাই।
মধ্য রাত চিরে ভুবনের চীৎকার গঞ্জকে বিঁধল। বাপ রে! এখন উপায়?
(সেকালে এ আর এমন কি! খুন, জখম, ডাকাতি, চুরি, লুট, ছিনতাই ও হাতের মোয়া। দেশে কি তেমন শাসন ছিল?
বাহা! বাহা! ভাবটা এমন যেন শাসনের দাপট থাকলিই চুরি-ডাকাতি, খুনো-খুনি কমত।
কমত না?
না হে না। মানুষে মানুষে ফারাক বাড়াবে,—তোমার আছে আমার নাই-এর ফারাক —শান্তি আসবে না হাতি! একালে ত আইন-আদালত, শাসন-টাশন, সিপাই-সান্ত্রীর অভাব নেই; বলি, জেলগ্লো কি ফাঁকা? কোর্ট-কাচারী কি মামলাহীন? তাও বা কেন, দিনে-দুপ্রে ডাকাতি-ছিনতাই, খুন-খারাবি, লুট-পাট, ধর্ষণ-টর্ষণ—)

০

অন্ধকারে মুখোমুখি বাপ-প্ত। বড় কাছাকাছি।
বাপ্, তোকে এট্র মিছা বলতি লাগবে।
কী-ই! অবাক ধনা বাপের ম্খে চোখ রাখে। কী-ই-?
জানে বাঁচার জন্যি তোকে এট্র মিছা বলতি লাগবে।
আবার কও।
ভুবন থ।
এমন কথা জন্মদাতা পিতা হয়ে সন্তানকে বলতে পারে ধনার জানা ছিল না। সে বিস্ময়ে শুধলে, তুমি সজ্ঞানে বলতিছ?
হ্যাঁ বাপ্, যা বলিছি সজ্ঞানে বলিছি। তোকে বলতি লাগবে, ঝড়ের খনে, যখন দেয়া আকাশ তোলাপাড়া করতিছিল, যখন আমরা গঞ্জের ছাউনির তলে পরাণ বাঁচাতি, তখন—গড়গড় করে অবলীলায় বলে গেল ভুবন, যেন এ এমন কিছু না, যেন এমনতর কথা নিত্যি বলে বলে সে অভ্যস্ত।
ধনা তখনো ঠিক ঠিক ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না বাপ হয়ে ছেলেকে এমন কথা কি করে বলছে! এ কী ওর জন্মদাতা বাপই বলছে? ধনা ম্খ তুলল। সুমুখে ঝড়ে আলুথালু চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ জোড়া কোটরে বসা ভুবন, তার বাপ। তাঁর বাপ-ই এমন অন্যায্যি বলতিছে! বলতিছে, তাহা মিছা বলতি!
যদি সত্য কই?

মানবি নে বাপ। ঘাড় ধরি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করি ছাড়বি।

কিন্তুক, সত্যি ঘটিছে ত?

ঘটালিও বাপ সত্যি হবে নাই। বিশ্বাস করবে নাই। বলবে, বাপে-পুতে সড় করি বলতিছে। বলবে, সব-ই সাজান কথা।

আবছা অন্ধকারে চোখে চোখ বিঁধে কতক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইল ধনা।

এই বাপ্! অথচ বুদ্ধি হওয়া তক্ দিনে-রাতে, হাটে-বাটে-মাঠে পাখী পড়ানোর মতো শিখিয়েছে, —সত্যই ধর্ম বাপ। সত্যে যে থাকে দুঃখ তার কপালে লেখা ঠিক, কিন্তুক শেষ্ তক্ জিত্ তার-ই। গপ্প বলেছে পুরাণের, বলেছে রামের কথা, যুধিষ্ঠিরের কথা।

সেই বাপ কিনা এখন সজ্ঞানে বলতিছে, মিছা বলতি লাগবে। ধনা মাথা নাড়ে, বলে, না বাপ, সে আমার দ্বারা হবে নাই। তুমিই ত বলিছ, ওতে পাপ বর্তাবি। মাষ্টারও কয়—

না রে পুত, হাঁছা কথা ঘুরাই বললি পাপ নাই। বিশ্বাস করানই কথা।

বটে! বটে! ধনার খুব ইচ্ছে হল বলে, এ ত ঘুরান কথা না, এ ত বানান কথা। বানান কথা ত মিছা কথাই। আর মিছা যে কয়, তুমিই বলিছ—

ভুবন ভাবছে, বড় অল্প বয়সে ছেলেকে এই সংসারী ঝড়-জলে টেনে এনে মস্ত ভুল করেছে সে। ছেলের এত সব বোঝার বয়স হয় নাই। সে জানে না, বোঝে না দুনিয়ার হালচাল, বাঁচনের রীতনীত। সে শোনা কথা মনে করে রেখেছে। ঠেকে নাই কোথাও, দেখে নাই কিচ্ছুও, শেখেও নাই। ইচ্ছে হল বলে, বাপরে! আমার সেই কথা গুপান কথার কথা। ও সব বাপেরেই বলতি হয়। আর রসময় মাষ্টারের কথা! ও তো বইয়ে লেখা কথা, সত্যি নয়। পড়া বিদ্যা বাপ মুখস্থ করার জন্যি, মনে রাখার জন্যি, ও কথা মেনে মানি জীবনে হাঁটন যায় না। জীবন বাপ—

ধনা লক্ষ্য করছে ভুবন কি যেন কি বলতে চাইছে, পারছে না। কিন্তু মুখের রেখার বদল, চোখের রঙের বদল, ঘনঘন মাথা নাড়ার ধরণে ধনার মনে হল, বাপ কথা গুছচ্ছে, ধনার মনে পড়েছে রসময় মাষ্টারের কথা,—একটি মিছার পিঠে হাজারটা মিছা বলতি লাগে, একটি মিছা ঢাকতি- হাজারটা—অতএব সদা সত্য বলিবে, কদাপি মিথ্যা কহিবে না। মিথ্যা কহা পাপ। মনে পড়ছে মাষ্টারের পড়ানো, দুর্জনের সহবাস ভালো নয়। খলের ছলের অভাব নাই।

ধনা বাপের দিকে বড় বড় চোখে তাকালে। সন্দেহ কিলবিল করছে, মনে হচ্ছে, যে বাপ আপন ছেলেকে মিছা বলতি-বলতি পারে সে-মানুষ সব পারে। দেখল, সে দুর্জন, সে—

ছেলে অমন মাথা তুলি আছে কেনে? অমন রাঙা চোখে তাকায় কেনে? হল কি? কি হয়িছে? ভেতরে ভেতরে তাতছে ভুবন। হাত-পা নিষপিষ করছে। নিঘ্যাত রসময় মাষ্টারের পাঠশালাই কাল। নিঘ্যাত শুয়োরের বাচ্চা বইয়ের বিদ্যে মনে ধরি রাখিছে।

শোন বাপ্, বইয়ের লিখা শুনীতি ভাল, পড়াতি ভাল, মনে করি রাখা ভাল, কিন্তুক —অন্ধকারে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, তুই চাস্ ভিটে-বাড়ী নিলেমে উঠুক, বুড়ো

বয়সে পথে বসি ? অবশ্যি ভিটে-বাড়ী-নাও আমার না, তোর মা-দিদিমার। আমি ত পাহারাদার বই না। তা এ যদি তোর ইচ্ছা পুত, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তা হলি—
উঠতে যাচ্ছিল ভুবন, ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত ধরলে। ঠিক আছে, তোমার কথা মতনই হবে।

o

সেই রাত্তেই বাপ-পুত দুজনে মাথা নীচু করে আড়তদারের গদীতে গেল। গদী বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের পাইকারদের অনেক ঢু'ড়েও কারো টিকিটি দেখা গেল না। পুরো রাত্তির বাপ ছেলেকে হাঁটুতে মুখ গু'জে কাটাতে হবে।
চল নায়ে ফিরি।
দু'জনে ফিরে এসে পাশে এনে রাখা দুমরানো ছই বসাল নায়ে। তলায় গিয়ে দুজনে বসল। মাথা পাতবে পাটাতনে সে ইচ্ছা আর অবশিষ্ট নাই।
ভুবন ভাবছে, যদি আড়তদার না মানে, যদি মালের দামের উপরে লাভ শুদ্ধ জুড়ি দেয়, যদি— হা ঈশ্বর! ছেলে, বউ শাউড়ী নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? এ বয়সে আর কি কিছু গুছিয়ে তোলা যাবে? যদি না যায়, হা রে কপাল—
ধনা ভাবছে, বাপ নিঘ্যাত অমঙ্গল চিন্তা করছে। কেন রে বাপ? দোষ ত আমাদের না। দিনকালের দোষে দেয়া ডাকলি, ঝড়-জল নামলি, মাঝ রাত্তিরে নৌকোয় ডাকাত পড়লি—এ ত আকছার হয়। তাহলি আমাদের দোষ?
অ বাপ, অত ভাবনার কি আছে?
না রে পুত্ত, পরের খরিদা মালের দায়, ডাকাত পড়িছে বললি যদি না মানে—
বাহ্ রে, এ নতুন নাকি?
হক্ কথা বাপ্। তা তুই কি ডাকাত ঠেকিয়েছিস্? ঠেকালি যদি শরীলে সেই ঠেকানর দাগ কই? রক্তের, লাঠির, ঘায়ের দাগ?
অত লোকেরে ঠেকাই সাধ্যি কি? সাধ করে কি—
নাহ্ বাপ। ঠেকাতি গেলি যদি জান যেত, যদি—
তা হলি—
না না ঠেকানর সাধ করিস নাই বাঁচিয়েছিস্। নইলে তোর মায়েরে কি জবাব দিতাম? তোর দিদিমারে? বাপ্ রে, আমার সান্ত্বনা কি থাকত? বল.ত বল.ত ধনার মাথাটা বুকে টেনে নিলে। বললে, পরাণে বে'চে আছিস্ এই ঢের। যদি অঘটন ঘটত? থেমে যোগ করলে, ধনারে, বাঁচি থাকনের মতন আর কিছু না।

o

আহ্, ঐ আঁধার ভাঙতিছে, আকাশ রাঙ্‌তিছে, ঐ বুঝি পাখী ডাকল। আহা রে! মানুষ জাগতিছে, দুনিয়া জাগতিছে।
গেল রাতে কি সর্বনাশ ঘটিয়েছে যখন সব্বাই দেখবে, যখন জানবে দেয়া কি ধ্বংস চান্দিকে নামিয়েছে, যখন বুঝবে এই দুনিয়া দাপানো মানুষ দুনিয়াদারের হাতে তৃণটি না, হায় হায় রে! এ দিন যে কি দুদিন বয়ে আনতিছে, কি দুঃখু লিখা আছে কপালে

কি সব্বোনাশ যে আরো ওৎ পাতি আছে—যদি জানত, যদি জানা যেত, যদি—
কাঁপতে কাঁপতে ভুবন উঠে দাঁড়াল। এবার যেতি লাগে।

০

ভোর ভোর গদীতে এসেছে মহাজনরা। হাটুরে পাইকাবরাও। চার দিকে সর্বনাশের হিসেব-নিকেশ। কে কিভাবে অমন হাহাকারী দুর্যোগে বেঁচেছিল তার বলাবলি। উফ্ কি হল্লা! কথার খৈ ফুটছে গঞ্জ ঘিরে, চিৎকার, কান্না, চেঁচামেচি।

ঐ রাত্তিরে বেশ লুটপাট হয়েছে, ডাকাত্তিও।

জনে জনে হা-হুতাশের অন্ত নেই। মহাজনরা, হাটুরেরা সব শুনে বুঝে কপাল বলে, ভগবানের ইচ্ছে, আল্লার ইচ্ছে বলে অসংশয়ে মেনে নিয়েছে। ভুবনও ছেলেকে যেমন বলতে বলেছে তেমনি বলেছে। মহাজনরা শুনে যথারীতি দুঃখ করেছে। বলেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ভুবন। চৌপহর রাতের দুঃস্বপ্নের দুঃখের ঘোর কেটে হাসি ফুটছে ঠোঁটে। কিন্তুক ছেলে যে মুখ তুলি তাকাতিছে না, হাসতিছে না। অত মুখ ভার কেনে? ছেলে কি—

তুই আমারে দুষছিস্ বাপ? ভাবছিস্, বাপ তোর মন্দ! তা বটি! তবে জানি রাখ, ভাগ্য গুণে রেয়াৎ রেয়াৎ না। দৈব সহায় তাই মানে মানে ফিরেছি। নইলে বুঝতিস্ কত ধানে কত চাল!

আমি কি কিছু—

তা না, তা না। কথা যে কয় তারে বোঝান যায়। তুই যে বোবা সাজছিস্, তাই দুঃখু। মনে হয়, ছেলে আমায় দুষতিছে।

এমনটি কি আর ঠেকিছ?

নাহ্।

তা হলি অমন ভাবলি যে!

অন্যেরা যে ঠেকিছে। ওদের যে ভিটে-মাটি, বাড়ি-ঘর—

নাম কও।

ইয়াসীন, বুধন, নবা—

ওরা নিজেরা করে নাই ঠিক জান?

এ ত বাপ বড় কথা। শুনিছি ওই যা।

ঐ ত, শোনা কথায় কান ভার কর, অথচ—

ভুবনের মনে হল এ যাত্রায় মহাজনরা রেয়াৎ না করলেই ভাল ছিল। ছেলে বুঝত, ঠেলার নাম কি! যখন নৌকো, ভিটে-বাড়ি, জমি-জিরেত ধরে টান দিত। মুখ বললে, বয়স ত তোর চার আঙুলের সর কন্নও ছোঁয় নাই বাপ, দুনিয়ার হাল-চাল—

সে আমার বুঝি কাজ নাই।

সে আর বুঝবি কেনে? সবে ত হাতে খড়ি।

যা ঘটল তা ত মিছা না।

সত্যিও না বাপ্। এমনটি দৈবে ঘটায়।

থো তোমার দৈব-টৈব। ডাকাত পড়িছিল ত?

বুঝলাম পড়িছিল। মানলাম সব ঠিক। কিন্তুক কেউ কি সাক্ষী আছে?
উফ্ মা, মাঝ রাত্তিরে কে জাগি বসি থাকবি সাক্ষী দিতে?
ঐ ত বাপ্! আমরা বাপ-পুত যে ধম্মপত্তুর, মহাজন মানবি কেনে? ইয়াসিন, রাখল, নবার কথা ত উড়াই দিলি, না? তাহলি ক', আমরাও বেচে দিতি পারি। কি? পারি না?
বিস্ময় ক্ষোভের রঙ ধরেছে। চোখে ঝিলিক দিচ্ছে ঠাট্টা। বাঁকা গলায় শুধলে, পারি বুঝি?
ভুবন এতর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। থতমত খায়। এন্দূর গড়াবে সেও কি ভেবেছিল। কথার গদে মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে বৈ ত নয়। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে নিজেকে শোধরাতে গিয়ে বললে, তা না, তা না—
ধনার খাড়া মুখ বুকে ঝুঁকল। ঘেন্না! ঘেন্না! সে পা চালিয়ে তফাতে সরে গেল। রোদ্দুর চড়ছে।
নিরুপায়, হতভম্ব ভুবন দুমরানো ছইয়ের তলায় নিজেকে গুঁজে দিলে। তারও গা বমি বমি করছে। ঘেন্না উথলোচ্ছে। নিজের উপর, সংসারের উপর, ছেলের উপর।
মা গো! এ কোথায় ঠেলে দিলা! শেষে কিনা নিজের ছেলেও ধিক্কার দেয়! আহ্, আ রে!

o

সাত রাজার ধন সোনা আমার, মায়ের বুকের মাণিক, বড় আকিঞ্চের ধন তুই, তুইও আমারে ভুল বুঝলি। কাঁচা বয়স তোর, দুনিয়া কি এখনো জানলি নাই, বুঝলি নাই। যত সোজা ভাবতিছিস্ বাপ, এ দুনিয়া ততো সোজা না। তাছাড়া পুত, এসব ত আজিকালি ঘটতিছে না, সেই কবে থিকা ঘটি আসতিছে। নইলে আমার ঠাকুদ্দার ত সব ছিল, জমি-জিরেত, হালের গরু-মোষ, বাগান, বাড়ী, দিঘী, পুকুর--এই সব গেল কোথায় ক'? কে নিলে? লোকে কয় বটে বদনেশায় উড়ায়ে ফুরায়ে দিছে। সত্যি না বাপ, তাহা মিছা। মশাইদের রটনা। আসলে তেনারাই নানান কায়দা কসরতে খাস করি নিছে।
সেই সেই কালে বাপ, ঠাকুদ্দার যৌবনকালে, মশাইরা ছিল কোথায়? তখন নবাবীর কাল, খাজনা আদায় উশুলে ছিল হাজার দু-হাজারী ফৌজদারের তহশীলদার। তখন জমির মালিক নবাব। জমির দখলদার বল দখলদার, ভোগদার বল ভোগদার ওই চাষাভুষা। মাঝে আর কেউ ছিল নাই কো। ফৌজদাররা ত বলতি গেলে নবাবের গোলাম, বান্দা! সেদিন বদলি গেল বাপ। এল গোরারা। সব উল্ট দিলে। বন্দোবস্তী দিলে গায়ে-গতরেওয়ালা জাতপাতের হিন্দু-মোছরমানদের। নিয়ম মাফিক তারা হলেন জমিদার, চাষারা তেনাদের প্রজা। ওরা গোরাদের থোক দিবে, ব্যস্। সে কত সে জানবি মশায়রা আর গোরারা। কিন্তু কি চাষাদের কত খাজনা ঠিক করবি তারা, ওতে চাষী বাঁচুক-মরুক কার কি! ফল যা হবার হল। চাষারা পলকে হয়ে গেল মশায়দের খাস তালুকের বান্দা। লেজে মারলিও মরণ, গলা কাটলিও মরণ। ওঠ বলতি ওঠ, বস বলতি বস। তার উপরে চাপালি এ-দায় সে-দায়। শুরুতে ছিল বছরের মাথায় মাথায়, পরে ঘড়ি ঘড়ি। মশায়রা জমি

দেখতে এয়েছেন, নজরানা দাও ; মশায়দের ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদী-ভেট দাও ; মশায়দের বাপ-খুড়ো মরে স্বগ্গে গেছে, ছাদ্দ-শান্তি—কড়ি গোনো। বল বাপ, এক ফসলী ধানী জমি, চাষীর ছেলেপুলেের সম্বচ্ছরের খেরোক-পোষাক জোগান দিয়ে অত শত আব্দার মেটাতি পারে ? ফলে দায় বর্তালে। সময়ে না দিতি পারলি গোনো সুদ চক্রবিদ্ধি হারে। আসলে-সুদে গিলে নিলে জমি-জিরেত, গরু, মোষ, বাগান, বাড়ি। সব তেনাদের গব্বে গেলে হও ভাগচাষী। সেও গেলে বাপ ভিখিরী গো, ভিখিরী। মোদেরও ভাগ্যে তাই বর্তালে। তখন থাকি মশায়দের দয়ায় তেনাদের পাছ পুকুরের পাড়ে। জমি গেল, হাল চাষের দায় ঘুচল। রইল কি ? ছিল মজুরী। বাপ বললি পরের জমিতে মজুরী ? গতর বাঁধা দেয়া ? দূর। দূর। বাপ হঠাৎ এক রাত্তিরে স্বপন পেলে, চাউর হয়ে গেল ভোর হতেই। তখন দেশ-গাঁয়ে বড় মায়ের দয়া হত। তা সেই সব গুটির ওষুধ পেলে বাপ। জাত চাষী রাতারাতি বৈদ্যি বনি গেল। বাপ ভাবলে মান বাঁচল। মজুর ত নই, বৈদ্যি বটেক্। দশে ডাকে, দশে মানে। মরার আগে বাপ ওষুধ দেখিয়ে দিলে, মন্তর পড়িয়ে শিখিয়ে দিলে। হবু বৈদ্যির পুতও বৈদ্যি। এখন মনে হয়, ও কি মান না হাতি। দুয়ারে দুয়ারে ভালের নামে হত্যি দিয়ে পড়ি থাকা, জুটল হবিষ্যি খাও, না জুটলি ত পেটে বালিশ বাঁধো, মরো। ভয়ে ভয়ে ঝাড়ফুঁক শিখলাম, হাজার কিসিমের মন্তর-টন্তর। তাতেও কি চলে বাপ। তার উপরে নেশার কামড়। তুক্তাক্, টাঁড়নাড়ি, অত কায়দা-কানুন, ভুজুং-ভাজুং উফ্ বাপরে, মাপিঝুপি, লোকের মনের হদিশ বুঝি, ভাবিচিন্তি কথা বলার সে কি হেপা। তারপরেও দুবেলার দু' মুঠা জোটান দায়। মনে কর তোর ছোট বেলা ; বল, মাসে ক'দিন জুটিছে ?

বাপ আমার, দুনিয়াটা খালি চোখে দেখতি চ্যাপ্টা, চোখ পাতলিই মনে হয় উঈ বুঝি দুনিয়ার শেষ তক্ দেখতিছি, ঠিক না পুত, ঠিক না। দুনিয়া আরো বড়। মনে হয় এমন সবুজ সোন্দর বুঝি আর কিছু না—ঠিক নয়। ঘুরি দেখ, চোখ পাত, দেখবি ওই সোন্দর সবুজ ঝোপে-ঝাড়ে বাঘ আছে, সিংহ আছে, ভালুক আছে, শেয়াল, শকুন, চিতা। খানা-খন্দে সাপ-খোপ, কুমীর। লতায় পাতায় পোকা-জোঁক। বাপরে। দুনিয়াটা বড় কঠিন ঠাঁই। কে যে কখন কামড় বসাবি ঠিক কি ? কোথায় যে মরণ ঘাপটি মারি আছে জানতি পারবি নাই। তাই কই, সৎ হওয়া ভাল, সৎ হওয়ার ইচ্ছে থাকা ভাল, কিন্তু বাপ, ওরা যে থাকতি দিবে নাই। ওরা সব্বাই তক্কে তক্কে আছে। বাগে পেয়েছে কি অমনি খুবলাবে, অমনি—

ভুবন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধনা ঝুঁকে পড়তেই পষ্ট দেখল মুখের 'পরে চোখের জলের দাগ। ভিজে আছে কাৎ করা মাথার নীচে ভাঁজ করা হাতের 'পরে খোয়া গামছার কিছুটা। ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলে না। বাপ নিঘ্যাত অভিমানে দুঃখে কাঁদতি কাঁদতি ঘুমিয়ে পড়িছে। নিঘ্যাত দুঃখু বেজেছে মনে। বালক। সে কি করতি পারে ? নিজের দোষে নিজে—

গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে, কি। খাবা না ?

কে ধনা ? না বাপ, শরীরটা জুত নাই।

ও কিছু না, ওঠো, ওঠো।
তুই যা—
না, না, তুমিও চলো।
আমি ? অভিমান গলা জুড়ে। বলার কথাগুলান ছেলেকে বলা হল নাই। অথচ এই ছেলেকেই আর অবর্তমানে ওই মাঠ-ঘাট, জলা-জঙ্গল, খানা-খন্দ, টিলা-টুলা ডিঙিয়ে হাঁটি যেতি হবে মরণ তক্। ভুবন ভাবলে, এই-ই সুযোগ, বলার কথাগুলান—
শোন বাপ, কিছু বলার কথা আছে।
এখন থোও কথা। পেট ডাকতিছে। কথা পরেও হতি পারে।
তা পারে। কিন্তুক এই কথা এক্ষুনিই বলা লাগে।
আহ্, থোও তোমার কথা। ঘাট হয়িছে। এই কান মলছি, নাক মলতিছি, জিভ কাটতিছি। তখন তোমার কথা ঠিক ঠিক বুঝি নাই। মোল্লাখালীর নিবারণ কাকা গো, এতক্ষণ পাখী পড়ান পড়িয়েছে, এখন সব বুঝি। আর বুঝায়ে কাজ নাই, এখন ওঠ।
হাত ধরে বসিয়ে দিলে ভুবনকে। বললে, চোখে মুখে জল দাও দিকিন। চলো।
কি বুঝিয়েছে নিবারণ ? কি বলেছে ? আমার মনের বলার কথা কি নিবারণ তেমনটি বোঝাতি পারিছে ? একজনের মনের কথা আর একজন কি তেমন করি বোঝাতি পারে ? না গো না। আমার মনের কথা নিবারণ জানবি কেনে ? নিবারণ নিঘ্যাত নিবারণের মতন বলিছে। আমার কথা অন্য, আমি—
ভুবন পায়ে পায়ে উঠে এসেছে ডাঙায়। বেলা মাথার 'পরে। পেটে কেঁচো পাক দিচ্ছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখন থাক। জীবনটা ত আর এক্ষুনি ফুরাতিছে না। এক্ষুনি বলতি লাগবে তার-ই বা কি কথা আছে। কাল বলব, পরশু বলব, না হয় তার পরের দিন। তবে হ্যাঁ, বলতি লাগবেই। বলব, বাপ আমার, এই পোড়া সংসারে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে নাই, উঠবে নাই—আমার কথা বিশ্বেস না হয় তুই-ই পরখ কর ॥

৩ (ক)

নাই ?
যা পাই তা খাই।
নাই ?
কুড়িয়ে গোবর ঘুঁটে পোড়াই।
নাই ?
পেটে ভুলো, পিঠে কুলো, দিনে রাতে গড়াই।
তা ভগবান মস্করা করলে। তিনকাল এ-দোর ও-দোর ঠেঙিয়ে যখন বাঁশের মাচানে

ওঠার ডাক এই আসে কি সেই আসে, কাঁধ দেয়ার মানুষ-জনও যখন পেরায় ঠিকঠাক, তখন কিনা গাঁজা ভাঙের ধুঁয়ো রাঙানো হাতে জমি-জিরেত, হাল-নৌকোর দাঁড় ধরিয়ে দিলে! শালা—

o

আছে যখন মরি মরি ধরি রাখো। তখন কে যেন ভিতর থিকা হাঁকি ডাকি কয়, ওই তোর সম্বল, তোর ছেলে-বউর সম্বল, ও তোর উষ্টিগুষ্টির নিশ্চিন্দি। ও রইল ত সবই রইল। মান রইল, পেট পুরানোর ভাবনা ঘুচল, দোরে দোরে হাত পাতি দাঁড়ানোর দায় ঘুচল। ও রাখলি ত সব থাকল।

তা রাখব বললি রাখা যায়? বলি, রাখার দায় নাই, দায়িত্তি নাই? তা শালার ছেলে বিগড়ালে। বুড়ো বয়সের এঁড়ে, বেশি ট্যাঁ ফুঁ করলি যদি গতর ধরি ঝাঁকুনি দেয়, যদি মুখির উপর কুবাক্যি বলে, যদি মান যায়। তা মান বাঁচাতি মানি নিলাম ইজ্জত বাঁচল।

কিন্তুক—

তুমি ছাড়লি যে কমলি তোমারে ছাড়বি তেমন ত কথা নাই। ধর, তুমি থির করলা কোনো দায়ে-দায়িত্বে থাকবা না, কারো সাতে-পাঁচে না, কান দেবা না কারো সুখে-দুখে, পা দেবা না কারো আলে-টালে—তাহলিও বাঁচতি পারবা না। তোমার অনিচ্ছে তাতে কি? সংসারটা ত আর পাহাড়ের চূড়ায় বাঁধা ঘর না, জলের মধ্যির টঙও না। চাদ্দিকে দশজনা আছে, ওরা ছাড়বি কেনে? বলবি বটে, আহা বড় ভালো মানুষ গো, কারো সাতে-পাঁচে নাই, নিজেরে নিয়া থাকে। —বলি, এ নিন্দে না গুণগাওয়া, কে বুকে হাত রাখি বলবি? হয়ত মুখি ঐ বলল বটে, কিন্তুক দেখগে মনে মনে বলতিছে, হালার হাষ্যি-বুদ্ধি নাই, যে পারে সে-টুপি পরায়। বোকা! বেহদ্দ বোকা! এমন গবেটও এ বিশ্ব সংসারে থাকে!

তাই কই, এ সংসারটা বড় কঠিন ঠাঁই। এ হল শাঁখের করাত। এগোলিও কাটে, পিছোলিও কাটে।

বয়সী ভুবন আগু-পিছু করে সামাল দেয়।

o

শাশুড়ীর নাম জানকীবালা। মেয়ে মানে ভুবনের স্ত্রীর নাম চপলারাণী। শ্বশুর হরনাথ।

হরনাথের ও নিঘ্যাত শ্বশুর বাড়ী ছিল। দীর্ঘদিন কোনো খোঁজ-খবর ছিল না। হরনাথ মরলেও না। কে কার খোঁজ রাখে। আসলে জানকীবালার মা বাপ মরেছে অনেক কাল আগে। মায়ের পেটের ভাই বোনও নেই। ছিল না। তাছাড়া, সে ও কি এ ঠাঁই। ধ্যাড়ধেড়ে কোন গোবিন্দপুরে। দুদিন এক রাত্তিরের রাস্তা। তাও পায়ে হাঁটা পথে নয়, নৌকোয়। সেই বাখরগঞ্জে। সেখানে শাশুড়ী জানকীবালার বাপের দ্বিতীয় পক্ষের নাকি এক ছেলে ছিল, জানকীবালার সৎ ভাই। না থাকলে তার ছেলে শ্যামাচরণ এসে পিসি বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন? কেন বলবে, পিসি গো, তুই ছাড়া মোদের আপনজন আর কেউ নাই।

জানকী থ। চপলা ত আকাশে থেকে পড়ে। কে না কে? তা মুখের আদল, বলার ঢঙ, শরীরের বর্ণ, গড়ন, চৌহদ্দীর ঘটাপটা বিবরণ—
পেত্যয় হতে দেরী লাগে না। তাছাড়া মিথ্যে মিথ্যে এদ্দুর আসবি কেন?
মা নাকি আগেই মরেছে, বাপ মরেছে মাস দেড়েক আগে। সম্বল তেমন কিছু ছিল না, শ্যামা পরের বাড়ি গতর খাটিয়ে এত বড়। ধারণা ছিল ভিটে বাড়ি আছে। তা বাপ মরতে জানল সব দেনার দায়ে বিকিয়েছে বাপ মরার আগেই। অশৌচী ঘর ছাড়া করলে দশে দুষবে, সেই জন্যে ধৈর্য ধরে থাকা, মরা বাড়ির বার কর্তেই, দখল খত্তম। ভিটেয় পা রাখতি হয়নি শ্যামার। পরের দোরে দাঁড়িয়ে হবিষ্যি একাদশা-শ্রাদ্ধ চুকলে, মরণকালে বাপের সাধ পুরাতি পিসির ঠাঁই। বলেছিল, আমার এক দিদি, তোর পিসি বাপ, তার ঠাঁই যাবি, সে ভাইয়ের ছেলেরে ফেলতি পারবি না। সে ছাড়া এ সংসারে—
আহারে! মা-বাপ মরা অনাথ, বাছা আমার—জানকী হামলে পড়ে। ছিল বাপের বংশের এক ভাই, হোক সৎ, তবু ভাই তো! চোখের জল ঝরে অঝোরে। হা-হুতাশ বুকে গজরায়। বাপ পিতামোর বংশের একমাত্তর সলতে, শেষ চিহ্ন! ষাট্! ষাট্! বালাই ষাট্!
শ্যামা পিসির কোল পেল!

o

চপলা এই বয়সেই সংসারি আদিখ্যেতা কম দেখেনি। আপন সংসার করতে করতে হাড়ে হাড় টের পেয়েছে। ঘরে নাই খুদ ত হাঁক পাড়ত দুধের—এমন বেআক্কেলে বুড়ো মিনসে। একগাদা ভাঙ্-ধুতরো খোর সাঙাৎ জুটিয়ে আনত ডাল গেয়ে পাওয়া হবিষ্যির ভাগ নিতে। হাঁকে ডাকে পাড়া তুলত মাথায় যেন ঘরে জামাইরা এয়েছে নাতির মুখে-ভাতে। তা যেমন কুকুর তেমন মুগুর। মুড়ো ঝাড়ু হাতে তেড়ে গেলি তবেই বাঁচোয়া। কিন্তুক আপন মায়ের অজানা-অচেনা সৎ ভায়ের পুত নিয়ে আদিখ্যেতা চোখ মেলি দেখা ছাড়া উপায় কি! জমি-জিরেত মায়, ভিটে-বাড়ি নৌকো-টৌকোও। দানপত্তর ত আর হয় নাই। লিখে এই দিচ্ছি-দিব করে এদ্দিন। জোর করি তায় জো কি! তাছাড়া ভাগীদার ত কেউ ছিল নাই, তাছাড়াও না। কিন্তুক হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে—এ সড় নয় তো?

o

কথা জানকীই তুলল।
শ্যামা থাকলি ধনার দোসর হয়। জামাইর শরীর তেমন জুৎ না। নৌকোয় ত দুজনা চাই, নাকি?
হাঁ জোড় লাগে হালে দাঁড়ে। বড় ছাড়া ছাড়া কথা চপলার।
তাছাড়া জমি-জিরেত, ছাগল-গরু, হাঁস-মুরগী—
এ কথায় আগুন জ্বলল।
কি-ই! এদ্দিন এ ভাবনা ছিল নাই? বলি, আমি, তুমি কি করাতি আছি?
আমি আর কদ্দিন? জানকী তখনো টের পায়নি। তাছাড়া মেয়ের বলা-কওয়ায়

চণ্ড এট্টু অনুক্ষণে, সে জন্মাবধি। যেমন গলা, তেমনি ঝাঁজ।
তা আমারেও কি যমে ডাকতিছে নাকি?
জানকী কান খাড়া করে মেয়ের মুখে চোখ রাখে। ভাবটা এই যে, মন্দ কি বলিছি যে অমন—হল কি তোর? কথার রঙ-ঢঙ কেমন ভেন্ন লাগতিছে।
লাগে বুঝি? তয় বুঝি নাও।
কি বুঝব? জানকী ফোঁস করে মুখ তোলে।
এই বুঝি কুরুক্ষেত্তর বাধে। চপলা মার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে কথা ঘোরায়। মরণ আমার! বলি, বাসি ঘরের কাজ সব পড়ি রয়িছে, উনি শুরু করিছেন শ্যামার বারোমাস্যা!
জানকী থ। দেখো, কী কথায় কি! বলি, অমন চোপা দিচ্ছিস্ যে? কোথায় ভালরে বলে—
হ, ওই ভাল তোমার থাক।
ঐ শুরু।

০

কাছাকাছি পাশাপাশি থাকলি ও হয়, হবেই। শিলে নোড়ায় হয় না? মায়ে ঝিয়ে বাদ যাবে কেন—এক ভিটেয়, এক ঘরে যদি বাস। বাপে পুতে নয় কেন? ভায়ে-ভায়ে, ভায়ে-বোনে, পড়শি জনে—
সংসারটা ত আর এক সোতা নদী না। জোয়ার-ভাঁটি আছে, সুখ-দুঃখু আছে, আলো আন্ধার আছে। সব দিন কি সমান দিন?
তা মেনে মানিয়ে চলতি হয়, রাগ-বুঝ করি বাঁচতি হয়, অনেক হিসেব অনেক কিতেব করি বলতি হয়।
তা সব মানুষ কি সব পারে? না, পারে না, পারে নাই। মনে ঢুকতি পারলি না হয় মন বুঝি কথা বলা চলতি পারে। তা পরের মন ক'জনায় বোঝে? বোঝার চেষ্টা করে। সবুাই ত নিজের কথা সাতকাহন করি বলতি চায়, ধধ্যি ধরে না। ফলে আন্দাজে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তি হয়, ঠিক ঠিক লাগলি ভাল, না লাগলি ঠোকর!
চপলার মনে সন্দেহ! সে কি ধধ্যি ধরে! সে চায় তাড়িঘাড়ি হেস্তনেস্ত। তা তাড়িঘাড়ি বললি তাড়িঘাড়ি মিটবে কেন? ফলে গুজ-গুজ, ফুস-ফুস, অবশ্যি আপন মনে।
নিঘ্যাত ধনার ভাগে ভাগ বসাতি শ্যামা!

এই যদি জননী তোর মনে, তাহলি নাও পাঠিয়ে টেনে আনলি কেনে? যেমন ছিলাম, তেমন ছিলাম। জোটে খেয়েছি, না জোটে কপাল চাপড়িছি। তা বলি তোর দোরে হাত্যি দিই নাই। হাত পাতিছি, হ্যাঁ, সে জন্মোদাতা বাপের কাছে। তুই যে কি সে জন্মাবধি জানতি বাকি নাই। উঠতি-বসতি নাকঝাড়া—সে কি নিন্না নয়! গড়ন মন্দ, সেও আমার দোষ? গলার স্বর চেরা, সেও আমার দোষ? কান্না করতি চি ল পড়ল কি; হাত থিকা আচমকা খাঁস পড়ল কি, চলতি পায়ে ঠোকর লাগল কি, ভ.এ মনে কথা এইলিছি · কি—সব আমার দোষ। দোষ! দোষ! দোষ! অত দোষ যদি গুণের মান্ন তেখলি নাই কেনে? গুণ যদি নাই মন্তুরি সিয়ানোর পরে পাকা চিঁপ

দিলি নাই কেনে ? আহা ভগমান গায়ের বম্নে পোড়া পাতিলের কালিমাখা তলাও হার মানে, সে দায়ও কি আমার ? বলি, বাপ ওই, তুইও ওই, কাঠ কয়লা কোন ছার, তয় আমার বম্ন কি হলুদে চোপানো চাঁপার মতন হবে ? নাকি লাল টুস্‌টুসে জবা ? হ, অত যদি ঘেন্না, থাক তোর ভিটে মাটি, জমি-জিরেত, নাও-টাও। সোয়ামী পুত ফিরলিই হেস্ত নেস্ত। না জোটে ভিখ মাঙব, দোরে দোরে হাত পাতব, তবু রাক্কুসী মা, তোর ভাবে আর না।

ফলে চপলার দিন কাটছে রাগ পুষে, রাত অভিমানে, অনিদ্রায়।

o

অ মনি, অ সোনা, রাগ বাসি হতি দিতি নাই। অ ধনার মা, অ চপলী, রাগ মনে পুষতি নাই। মন্দ মনে বলিছে কিনা আগে পরখ কর। তাছাড়া, মা তোর মন্দ বলে নাই। সোয়ামী তোর তেজবরে। বয়স কি বসি থাকে ? ছেলে তোর সবে পনের, ধর যদি কোন অঘটন ঘটে, যদি—

ছেলে তোর একা সামাল দিতি পারবি কেনে ? তুই ত আর ছেলের দোসর হতি পারবি নাই। তখন একজনা চাই না ? সে ক্ষেত্তর হ'ক, ক্ষিরোদবাসী হ'ক। তার চাইতি শ্যামা মন্দ কি ! তিন কুলে নাই বলতি কেউ নাই, হ'ক অচেনা, তবু সম্পক্কে তোর ভাই, ছেলের মামা। পথে বসাবে এমন ভাবনা মনে ঠাঁই দিবি কেনে ?

যদি ভাগ চায় ? যদি মা আহেলা দরদ দিখিয়ে জমি পত্তর লিখি দেয় !

ওই দেখ ! হারানর মত তোদের ত কিছু ছিল নাই। না হয় দিল। কিছু দেয়া মানে ত সব দেয়া নয় মণি। বল, এ সংসারটা কি একার ভোগের ? দশ দিকে দশ জনেরে নিয়াই ত সংসার। বল, দশজনারই খাতি লাগবে কি না ? এক জনায় খেলি, ন' জনায় উপোষ, সে চলবি কেনে ? সেকি ভাল ? তার চে' না হয় ভাগ করি খেলি। না হয় ভাগে এট্টু কম পড়ল, কিন্তু সব্বাই বাঁচলি ত। তুইও বাঁচলি, দশেও বাঁচল। তাছাড়া এ সংসারে একা মানুষ—মানুষ না।

রহ্ ! রহ্ ! ভাগের মা গঙ্গা পায় না। একবার জুৎ হয়ে বসলি যে ছেলেরি পথে বসাবে না তার ঠিক কি ? বলি, বাপে-পুতে ভাগ ঘাটাঘাটি হয়, ভায়ে-ভায়ে হয়, মায়ে-ছেলেয় হয়, মায়ে-মেয়ে, ভাই-এ-বোনে। আর এ ত দূর সম্পক্কের মায়ের ভায়ের ছেলে। তাও ঠিক কিনা তার ঠিক কি। তাহলি—

অ মনি, অ সোনা, আগে ভাগে সব্বোনাশ ভাবতি নাই, অমঙ্গল ডাকতি নাই।

থোও তোমার 'নাই' 'নাই'।

আহা রে ! বুঝি, বুঝি, তোর ভয়-ডর বুঝি। মানুষ কি আর মানুষ আছে ? সংসারটারে খাটালেরও অধম করি থুয়েছে, দুশ্চিন্তে কি যায় ! তবু, মনিরে—

o

তেমনি ভরা আদিনে, ঝড় ছানি দেয়া মেঘ গজরানো-দুমরানোর মধ্যে ঘরে ফিরল উস্কোখুস্কো বাপ-পুত। চপলা প্রথম রাতে কানে বিষ ঢালবে কি ওদের রকম-সকম দেখে থ। যেন ঝড় বয়ে গেছে দুজনার উপর দিয়ে। যেমন রুক্ষ চেহারা-চলন, তেমন রুক্ষ বলা-কহা।

চপলা মনকে বোঝালে, ধয্যি ধর।

o

ধনা শ্যামাকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। পরিচয় হতেই ভাব গলায় গলায়।
ভুবন শয্যা নিলে। জানালে, শরীর বেজুৎ।
সে না হয় ধরণ দেখি ধরা গেল। কিন্তু আমদানী? কই পয়সা কড়ি? বলি, ঘরের জন্য আনিছ কি? কথা ছিল, চান্দের হাটের শাড়ী, কৈখালির শীতল পাটি আনবা; মুন্সীগঞ্জের মান, রামপুরের মুখী কচুর বীজ, ভাইসলের কুড়ো, ডাবুয়ার নলের গুড়, ফটিকছাড়ির তিলের নাড়ু, সুখচরের শাঁখা সিঁদুর। কিচ্ছু বলতি কিচ্ছু আনে নাই, খালি হাতে ফিরিছে!
অহ্ মা, কি হল ক' দেখি।
তাই ত! জানকীরও ওই ভাবনা। বলি, কি ঘটিছে? অ ধনা, ধনা রে—
ধনা ততক্ষণে শ্যামাকে নিয়ে গাঁ জরিপ করছে। দক্ষিণে খাল, উত্তরে থৈ থৈ বিরান জমি, দূরে বটতলা, পশ্চিমে মুসলমান পাড়া। তেঁতুলতলা ছাড়ালে বরোজ। আরো এগোলে হা হা আকাশের তলায় সবুজে-হলুদে রাঙানো, চিতানো গাঁ-গেরাম-দেশ—
ধনা গলা ছেড়ে গান ধরে—

এই দেশের মাটিরে ভাই
সোনার চাইতি খাঁটিরে ভাই
এই দেশেতে জনম মরণ
আর কি বাসনা থাকে রে—

ওদিকে জানকী মেয়েকে খোঁচায়। জামাইরে শুধা।
হ, এট্টু জিরাক। রয়ে-সয়ে শুধাতি হবে। মনে লয়, খারাপ কিছু ঘটিছে।
হ, আমারও মন কয়।

o

অবশেষে আদ্যোপান্ত জানা হল, শুধু বাপ-পুতের বিরোধটুকু ছাড়া। মায়ে-ঝিয়ে সলার শেষ নেই। শেষ তক্ চপলাও মায়ের সঙ্গে একমত, শ্যামা ঠিক সময়ে এসে পড়িছে। নইলে—
আহা! ঠেকায় পড়লি হরি!

o

ভুবন চপলাকে জান-পরাণ দিয়ে বুঝিয়েছে, যা নাই ত খুঁচিয়ে ঘা করা কেনে? মা কি বলিছে, শ্যামা ভাগ পাবে? ওকে লিখিপড়ি দিবে?
নাহ্, তা বলে নাই।
তাহলি? ভুবন চপলার মুখে চোখ রেখে হাসে। অহ্, মনের বাঘ!
যদি বলে, যদি কয় শ্যামারেও দিব।
আগে ত বুলি ফুটুক। তখন না হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তখন দেখা যাবি কত ধানে কত চাল। তখন—

চপলা ভুবনের মনের জোরে ভরসা পায়।
আসলে ভুবনও দিশাহীন। সেও জানে না তখন কি করতি হবে, কি করবে। সেও কথার পিঠে কথা বসিয়েছে মাত্তর। তবু বললে, যখনির যা তখনির তা। এখন চুপ যা ত।
মনে মনে নিজেকে বললে, আরো সামলে সুমলে চলা লাগবে, আরো মন ভিজিয়ে। হা রে কপাল! ভর পেট খাওয়ার জন্যি ক'জনারে মেনে-মানি চলতি লাগবে? বলি, ক'জনারে? মাগ, শাউড়ী, ছেলে—
না রে মন, চুপ যা। রহ্। দেখ্
o
দিনে কালে, বয়সের ভারে-ধারেও ভুবনের বুদ্ধি খুলেছে। সে দিন-রাত্তির শরীর নিয়ে ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত। উঃ আঃ ছাড়া মুখে অন্য রা নেই। শুধু এক ফাঁকে জানিয়ে দিয়েছে, সে এবার নায়ে যাবে না। শরীর জুৎ নাই।
সে-ই ভাল। যাক ছেলে। সঙ্গী শ্যামা। যাক্! যাক্! বঝুক কোন গাঙে কত জল। কোন বাঁকে কত তোড়!
চপলা ভয় পাচ্ছিল। জানকীও। শ্যামা নতুন দাড়ী, জল-বাতাসের হাল-চাল জানা নাই, যদি তাল সামলাতি না পারে, যদি—
ভুবন তাল ঠুকে সাহস দিলে। কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললে, ধনা আমার নালায়েক না, বুঝবাজ আছে, বুদ্ধিসুদ্ধিও। ধনার মা, সাহস করি যেতি দাও। সঙ্গে ত শ্যামা আছে, রইল।
ধনা অপলক চোখ থুয়েছে বাপের মুখে। তয়, রাগ এখনো পড়ে নাই। ভাল! ভাল! তা তুমি তোমার তেজ নিয়া থাক, মানাভিমান, দেখ, আমি কি করি, করতি পারি।
ভুবন ছেলের চোখ থোয়ার রকম দেখেই বুঝল। মনে মনে বললে, হ্যাঁ বাপ, যা। সাহসে বসতি লক্ষ্মী। সাহস যার আছে তার লাখান—
o
যাবার আগে ধনা বাপকে মান্যিতা দিয়ে গড় করলে, মাকে, ঠাক্মাকে।
দুগ্গা! দুগ্গা!!

৩ (খ)

মা মরা ছেলে শ্যামা। আঁচল ধরে বড় হয়ে ওঠার উপায়ই ছিল না। মা মরতেই বাপ ভালুই। ফলে এ-ঘাট, ও-ঘাট, এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া করতে হয়েছে।
পরের ঘরের ভাত অমনি অমনি জোটে না।
খাটতি হয় জান-পরাণ দিয়ে, মন বুঝে মন পুষতি হয় জোগানদার-জোগানদারনির।

ওঠ বলতি উঠতি হয়, চল বলতি হাঁটা, এমনকি ছুট্। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে শুনবি কেন? হাতে পায়ের ব্যথা! শুনবি কেন? আর, মাথার যন্ত্রণা—মাথা থাকলিই ব্যথা থাকে—ও কিছু না। যা ঠাণ্ডা জল হাত চুবিয়ে কপালে বুলিয়ে নে, সারি যাবে। তাছাড়া মাথা ত আর হাতের কাজ করবি নাই। তাহলি বাপ? দুই বেলার খেটন থাকবি থালাভর, গলা ভর, কাজ করবি নাই, ও কি হয়?

শ্যামা পরের বাড়ি কাজ করতি গিয়ে বুঝেছে নিজের সুখ-দুঃখের আওয়াজ দিতি নাই, নিজের ভালমন্দের কথা বড় মুখ করি বলতি নাই, যতক্ষণ গতর চলবি ততক্ষণ মুখ বুজি সয়ে যা। যে সয় সে মশয়। গতর না বয় ত ঢলি পড়, বিছানা নে।

তা বাপ, বিছানা নিয়েছ কি দানাপানিও বিছানা নিবে। সেই যে কথায় আছে না, উঠি দাঁড়ালি ভাগ্যও উঠি দাঁড়াবি, বসি পড়লি ভাগ্যও—

তা শ্যামার পেটটাই শ্যামার শত্তুর। ওটাই তার কাল। সর্বোক্ষণ খাই, খাই। তা পরের বাড়ীতে 'খাই' 'খাই' চলবি কেন? একবার ত এক মশয় পেটের পোকা মরার ওষুধই খাইয়ে দিলে। কোথায় পোকা-টোকা! কিচ্ছু না। আসলে—

সেই দানাপানি বন্ধ হবার ভয়ে শ্যামা কখনো বলে নাই শরীর বেজুৎ, গা গতরে—। দুঃখু, কষ্ট, জর-জ্বারি, চেপে-চুপে সয়েছে। মনকে বুঝিয়েছে, গতর আছে বলেই না গতরের কষ্ট। ও কিচ্ছু না।

এই সয়ে যাওয়া গুণ। যে সয় তার হয়। তার রয়।

শ্যামা এ যেমন বুঝেছে, দেখছেও তেমনি এক কাঁড়ি। এমন কি নিজেকেও।

o

এ সংসারে নিজের দোষ কেউ চোখ মেলি দেখে না। ফলে নিজের দোষ জানতি বুঝতি হয় পরের মুখ দেখি, চোখ দেখি, এমনকি পরের বাক্যির গড়ন-টড়ন, রাগ, ঝাল, পরের মুখ থেকি। শ্যামার যে একরাশ দোষ শ্যামাও কি জানত?

সে কাজে এট্টু ঢিলে, গতর নাড়াতি সময় নেয়; জবাব দিতিও। কিন্তু খায় এক কাঁড়ি। ভাত খাতি জল লাগে না, জল নেয় না, এমন কি শুধু গেলে চিবায়ও না; এ কি কম দোষ! এক কথা বাইশ বার বললিও কানে তোলে না, এই ভুলো মন কি কাজের লোকেরে মানায়? তা শ্যামা বলতি পারে বটে, এক কাম করতি করতি দশ কামের কথা মন্তরের মতন কানের কাছে জপলি মনে থাকবি তার কি কথা আছে? হাত ত দুইখানা একটা সংসারের বার-ভেত্তরে কামের কি অন্ত আছে! তা বাপু, সব কাজ দুই হাতে তুলতি লাগবি তাও কি হয়? অত কাজের জন্যি আরো জন লাগে। জানি, জন বাড়ালি খরচা। তা মাগো, সস্তায় পার পাতি হলি কিছু মুখ খরচা লাগবি। আমি গতর খোয়াব, তুমি মুখও নাড়বা না, ও কি চলে?

এ যেমন একদিক, তেমনি আবার যেখানে যেখানে কাজে-কামে লেগেছে সেখানেই দেখেছে কারো মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। সব্বাই অসুখী। সব্বাই জ্বলতিছে, পুড়তিছে। 'কি যেন নাই' এর দুঃখে সবার বুক ফাটতিছে। আহ্, কতো জ্বালা!

ও বাড়ীর গাইয়ের দুধ বেশি, ওদের জমির ফসল দুনো, ওদের গাছের ফলন ভাল, ওদের বাড়ি বড়—ওর সোয়ামী বড় ভাল, ছেলে বড় গায়ে গতরে, ওর হাতে-কানে সোনা, ওর মেয়ের বর—তখন শ্যামা বলেছে, না মাসী, সে কি! তোমার রাঙা গাইয়ের

জুড়ি দশ গাঁয়ে নাই, বাছুরটাও দেখ, কপালে চান, লেজে চামড়। আর দখিন বিলের জমি। জমি ত নয় ক্ষীরের ভাটি। পুকুর পাড়ের সিঁদুর আম মাসি অমেতে। হাজার গাছি কাঁঠালের কোঁয়া, আহারে, এমনটি রসো কাঁঠাল দেখাও দিকি সাত গাঁয়। মর্তমানের ঝাড়ের জুড়ি, কি বলি মাসী কোথাও দেখি নাই। তবে হ্যাঁ তোমাদের আমড়াটা জেতে ছোট, ও কিছু না। কিন্তু তুমি কও। মেসোর কেমন সংসার অন্ত পরাণ। তোমারও ত একদণ্ড দম ফেলার ফুরসুৎ নাই, কত খাটো, তবু মাসি, কে তোমার মুখ দেখি বলবি তুমি পিরতিমের মত নও। তাছাড়া তোমার নবা গবা হরি—ওরা সব ত সোনার চাঁদ। বিশ্বেস না লয়, বয়সকালে পরখ কর। নবার তোমার কাজ অন্ত পরাণ, গবার বুদ্ধি—কি বলব মাসি, বুড়ো মানুষেরেও চমকায়, তবে হরিটা এট্টু দুষ্টু। ওরে ছাড়ান দাও। বদ দোষ এট্টু-আধটু থাকে, দেখোখন বয়সকালে, সব কাটি যাবে। তাছাড়া ঘর দোর তোমাদের ছোটো না। লোকে বলে, তোমরা সম্পন্ন গেরস্থ। তা মাসি, পাতের বহরে তা বোঝন যায়। আত্মীয় কুটুম্ব—কারেও ত খালি মুখি, খালি হাতে ফিরতি দেখি না। বলতি কি, বড় মানুষের বড় মন। মন দেখি বুঝা যায়—

আহা! মাসির মুখে যেন রোদ্দুরে সদ্য ফোটা ফুল!

অ শ্যামা, বাপ আমার, নে, কোচড় মেল। যা, মুড়ি চিবুতি চিবুতি বাপ এট্টু দক্ষিণ পাড়টা দেখে আয়, গাইটাকে এট্টু নেড়ে দিস্। তারপরে নারকেলের ডালগুলো, পারিস যদি পাতা থেকে কঠিগুলানও—

হ যাই। হেসেই বলে শ্যামা।

০

মানুষের মন পাতি কি দশ মন তেল পোড়াতি হয়? না। আগে চোখ মেলি দেখ, মন পাতি বোঝ, কার কোথায় অসুখ, দুঃখু। বোঝ, রাগ-ঝাঁজ-ঝালের কারণ। বুঝে-সুঝে দাও আলতো হাতে পদ্মমধুর ফোঁটা, দেখো, যেন বেশি না পড়ে, ব্যস্। শ্যামা অচেনা অজানা পিসির মন পাবে তাও তার হিসাবে ছিল নাই, পেয়ে গেছে। কিন্তু দিদির?

তা ধনার সঙ্গে পাড়ি দিয়া ফিরি, দেখি, দিদি কি করি মুখ ফিরাই থাকে? হতি পারে গড়ন-রঙ বেঢপ; মুখের বাক্যিও মন্দ বটে; মেজাজও চড়া, তা হোক। নিঘ্যাত কোথাও দুঃখু আছে, জ্বালা। সেখানে দরদী হাত রাখলি হাত ফিরাবে তেমন খাণ্ডার নিশ্চয়ই না। গড়নের মতন মন? দূর! দূর! হাজার হোক মায়ের জাত, মাইয়ামানুষ ত!

০

যাবার সময় শ্যামাও জনে জনে মানিন্যত্তা দিয়ে গড় করেছে। মুখে বলেছে, দিদি, মামা-ভাগ্নে যেখানে ভয়-ডর নাই সেখানে। হাসি মুখি তুমি দুর্গা কও।

দুর্গা! দুর্গা!

০

এ দুনিয়ার সব কি আর কারো চেনা? কেউ কি বুকে হাত রাখি বলতি পারে

আঁতিপাঁতি সব চিনি, জানি। না গো না। তাহলি ?
আসলে দুনিয়াটা দিনে দিনে চিনবি, জানবি। অত যদি না চেনা-জানার ভয় তাহলি গাঁ-গেরাম ছাড়ি কোথাও যাওয়া চলবি নাই! কিন্তুক ঘরে বসি কি মানুষের দিন কাটে ? ঘোর গাঁ-গেরামে পড়ি থাকলি কি দেশ-দুনিয়া জানন-বোঝন যায় ?

সময় শ্যামারও হাত ধরছে।

০

এ-বাড়ি ও বাড়ি, এ-পাড়া ও-পাড়া করতে করতে শ্যামার ভয় কেটেছে। ধনাও বড় হয়ে উঠেছে বাপের হাত ধরে। এখন হালে ভয় নেই, দাঁড়ে ভয় নেই। মনের জোরে ডাঙা জল তার দুই-ই সমান।

শ্যামার ডাঙা চেনা। জলও একেবারে অচেনা তা নয়। পিসির বাড়ী আসতে দুদিন একরাত্তির ত তার জলেই কেটেছে।

আহা রে! সামনে ক্রোশ ক্রোশ ছড়ানো দুনিয়া জলে-ডাঙায়।

অতএব—বদর! বদর!

৩ (গ)

অ ভুবন! ভুবন!

অহ্ বাপ, এ সংসারে মান করতি নাই। মেনে মানিয়ে চলতি না পারলি দুঃখু ঠেকায় কোন বাপের পুত? এই দেখ, ছেলির পরে মান করি ঘরে বসি রইলি, এখন ঠেলা বোঝ।

ছড়ানো জমি-জিরেত বাপ নাওয়ের গুবাড়া। কেরায়া ভাল হয়েছে কি তুই গঞ্জের ঘাটে নাও ঠেকিয়ে দুদিন দুরাত্তির ফাঁকি দিলি। কেউ বলার নাই নাক উল্টিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে কেউ ঝগড়া করার নাই—দশের দায় কি তোর পিছন লাগার? বড় জোর শুধতি পারে, কি গো শরীর জুৎ নাই বুঝি? নয়ত বলতি পারে, কি হে দিন দুই খুব কামাই করিছ নাকি? হয়ত ছেলেও বলতি পারে, ঠায় বসি কাটবা?

জবাব একটা দিলিই হল। কিন্তুক ঘরে?

গোয়ালে গরু ডাকতিছে, ছোটো। ছাগল ডাকতিছে, ছোটো। আমের ডালটা ভেঙে পড়িছে, নারকেল গাছগুলান কান্দন কামানো হয় নাই, বেলের ডালে ধুঁধুল ধরিছে, কলার ঝাড়ে কেঁচো। মানের গোড়ায় ছাই দিতি লাগবে। পুকুর পাড়টা আগাছায় ছাওয়া। বাঁশ ঝাড় হেলে ঢলে গেছে। উঠোনের উত্তরে উলু মাথা তুলিছে। গন্ধরাজ নেবুর ডালে বাঁশ বাঁধি তুলতি লাগবে, পুঁইয়ের মাচানে ঠেকা দিতি লাগবে, গোয়ালের চালার খড় পাল্টাতি লাগবে—কত কাজ! কত কাজ! একগাদা কাজ বাপ তোর মুখের দিকি মুখিয়ে আছে। চোখ পাতলিই চোখ বাঁধা। বসি থাকবি জো

কি ? যদিকারো মুখ থিকা কুবাক্য ছিটোয়, যদি বলে খাবার লোক আছে করার কেউ নাই ? শরীরের দুয়ো দিয়ে কদ্দিন বাঁচবি বাপ !

এ কি হলো গো আমার ? আগে ত এত্ত সব নজরে আসত নাই। এখন আসে যে ! পোড়া চোখের কি নজর বাড়তিছে ? কৈ আগে ত কেউ এমন করি ডাকি বলত নারে। এখন ক্ষণে ক্ষণে বলতিছে যে ! কে বলে ? কে ?

না গো ভুবন, না। তখন ছিল নাই ত, দেখ নাই। এখন ?

হ, চোখের প'রে দুলতিছ।

O

মাগো ! আশা বড় সব্বনাশা

[প্রথম পর্ব সমাপ্ত]

দ্বিতীয় পর্ব ॥ ধনপতি উপাখ্যান

১

আকছার স্বপ্ন দেখত ভুবন। সে খপ্পরে পড়েছিল স্বপ্নের। সময় তাকে ঠেলে দিয়েছিল।

ভুবন বলত, স্বপ্ন দেখতি ত আর কড়ি লাগে না, তয় দেখতি দোষ কি?

তোর বাপ দেখত? ঠাকুদ্দা?

নাহ্।

তুই দেখতিস্ তোর সেই ভরা যৈবনে? সেই মাঝ বয়সে?

নাহ্।

তয় তুই এখন দেখিস যে?

আহ্ ঈশ্বর! চাদ্দিকে চোখ মেলি দেখো, কান পাতি শোনো। দেখতিছ না, শুনতিছ না, মানুষ এখন মরীয়া ছুটতিছে!

হ হ সে ত দেখতিছি, শুনতিছি। তা দু বেলার দুমুঠির জন্যি অত অত ছোটা লাগবি কেনে?

অই দেখ! শুধু দুবেলার দুমুঠি ভাবলি আর চলে? ভবিষ্যৎ ভাবতি লাগবে নাই? দেখতিছ না সুমুখে কি দিনকাল!

ভবিষ্যৎ? দিনকাল? আহ্ আ রে পোড়ারমুখো, তোর ওই এটুকুন মাথায় এতসব আজুলি-বাজুলি ঢোকালি কে? যদ্দুর মনে লয় তোর দৌড় ত ওই গঞ্জ তক্। তাহলি?

অহ্ হ, মোল্লার দৌড় মসজিদ! কিন্তুক ভিন দেশী গোরাদের গপ্প যে গাঁ-গঞ্জ ছুঁয়েছে। বলি, কানে ত কালা না, চোখও কি বুজি আছ? আজ্ঞা না। আমি তেনাদের ঠাঁটবাটের গপ্প শুনিছি। তেনারা না সেই সাত সমুদ্দুর তের নদী ডিঙিয়ে—বলেন, দুবেলার দুমুঠির জন্যি এদ্দুর?

০

ফলে চৌদ্দ ডিঙি না, সাত ডিঙিও না, নিদেন পঞ্চাশ দাঁড়ি একখানা ডিঙার স্বপ্ন দেখত ভুবন, যার নাম হতে পারত মধুকর। না, না, ভাল হত যদি নাম হত ভুবনমোহন,

যার পাল জুড়ত আকাশ, মাস্তুলে বিঁধত সূর্য-চন্দ্র, যে ডিঙা থৈ থৈ সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে দেশ বিদেশ ঢুঁড়ে বয়ে আনত—

ভুবন বেঁচে থাকতে থাকতেই ভুবনের সেই মান্ধাতাই ডিঙার স্বপ্নকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ধনা।

যখন লঞ্চ ভাসতিছে, জাহাজ ছুটতিছে, তখন কিনা ডিঙা!

ধনা দুই দাঁড়ি নৌকো বেচে ছোট্ট দোকান দিয়েছে গঞ্জে। যখন কানে গেল ভুবনের তখন ঢের দিন পার। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি ভুবন, বুঝতে দেয়নি ধনা। ছেলের দুঃসাহসের বহরে মাথা কুটেছে সে, মরেছে।

ভুবনের মৃত্যু আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। ধনার কাছে ত নয়ই। নেশা-ভাঙে-খাটুনিতে ক্ষয়া শরীর এদ্দিন যে টিকে ছিল এই-ই ঢের। তবে একটু দুঃখ বেজেছে লুকোচুরির জন্যে। তা সে লুকোচুরিতে যদি মন্দ ফলত!

নাহ্, মন্দ ফলে নাই। বিশ্বাস না হয় দেশেরে শুধাও, দশেরে শুধাও। বলুক লোকে, নৌকো বেচে মন্দ করেছি?

৩

ধনা এখন ধনপতি সওদাগর। কেনা বেচায় এমন তুখোড় ওই গঞ্জ এলাকায় আর নেই। ওই নাম ডাক গঞ্জের চৌহদ্দী ছাড়িয়েও অনেক দূর।

তা ধনা তোর বাপেরও ত ওই ইচ্ছেই ছিল, না কি? তবু—

আজ্ঞে, ধরণ ছিল ভিন্ন।

আহা! সেই সদাগর হবার জন্যি ত!

সে ত বটে! সে ত বটে!

তাহলি বাপের পরাণে দুঃখু দিলি যে?

বাপ আজ্ঞে বুঝতেই চাইলনি ত। বললে কিনা, আমি তার সুখে বাধ সাধিছি। আমি নাকি তার বয়সকালের স্বপন ভাঙি চুরমার করি দিছি। তা কেনে? বাপই ত বলিছিল, বাপরে, সাহসে বসতি লক্ষ্মী। বলিছে, সাহসের লাখান আর কিছু নাইরে, কিচ্ছু না। সাহস যার আছে—

ঠিক। ঠিক। কিন্তুক আনাড়ির কাছে এ যে দুঃসাহস বাপ!

এ ঠিক না। বাপ কি মাঝিগিরি মায়ের পেট থিকা শিখিছিল? দেখি শিখিছে, ঠেকি শিখিছে। তাছাড়া, দোকানদারীও কাকা মাঝদরিয়ায় ভাসা ডিঙার মতন। সময়ে পাল না তুললি, হাল না ধরলি, ঠিক সময়ে নোঙর না ফেললি—

ঠিক বাপ ঠিক। কিন্তুক এটুকুন বোঝার জন্যি ধনা হাতে-কলমে দোকানদারী করা লাগে। তোর বাপ ত আর—

নাহ্, বাপ আমার দোকানদার ছিল নাই ঠিক। কিন্তু ধর্য্যিও ছিল নাই। বুড়া বয়সের গোঁ, কিছু বলতি গেলেই থুক্, থুক্। যখন কলের জাহাজ জল কাটতিছে তখনও কিনা স্বপন দেখতিছে পঞ্চাশ দাঁড় নাওয়ের। দিনকালের বদল ঠাওরই করতি পারে নাই।

হে ঠিক। তা বাপ, এ দুনিয়ায় কজনাই বা ঠিক ঠিক ঠাওর করতি পারে? পারিছে?

তা না, তা না। আসলে নিজের কালে বসি ছেলের কালের কড়ি হিসেব করলি ওই হয়। বাপ-খুড়োদের আজ্ঞে ওই এক দোষ।

এক বুক দুঃখ নিয়ে হা-হুতাশ করে মরা বাপের জন্যে এ ক্ষোভ ধনার অনেকদিনের; ফলে, ধনার বলা কথায় নিবারণ চাকায়। বলে, হ ধন, যার কাল তার তার-ই হাতধরা। এ না বুঝলি বড় দুঃখু পেতি হয়। সত্যি তো, পিছু পড়া মানুষ কি আগু হাঁটা কালেরে ছুঁতি পাবে। না বাপ! তবে হ্যাঁ, তোর বাপেরও পুরা দোষ নাই। দেখা দেখি, শুনাশুনতি ইচ্ছা। তাছাড়া আমাদের জ্ঞান-গম্যি আর কত! দৌড় ত ঐ গঞ্জ তক্‌! বাপরে, ঐ গঞ্জে শোনা কাল-ই তোর বাপেরে গিলেছিল। ঐ সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে আসা—

ঐ নেশা আমারেও ধরিছে।

বুঝলাম না বাপ।

শহরে আড়ত করব ভাবত্তিছি।

কি-ই?

হ কাকা, বাসনা করিছি। দেখি কপাল ঠুকে—

ধন্য বাপ, ধন্য! আহা, এমন দিনে যদি তোর বাপ বাঁচি থাকত, যদি দেখত, যদি—

আশীব্বাদ করেন কাকা।

আহা! ও আর বলতি লাগে! মন-পরাণ দিয়া দু হাত তুলি তোরে আশীর্বাদ করতিছি, হোক, তোর বাড়-বাড়ন্ত হোক। দেশের-দশের মুখে আলো পড়ুক। তবে হ্যাঁ বাপ—

কি কাকা?

না থাক। ও শুনি তোর কাজ নাই। তাহলি ধন, আমি যাই। নিবারণ উঠতে উঠতে মনে মনে বললে ভাগ্যিস বলি নাই। জিভ বড় বাচাল। যদি বলতাম, বাপরে, কাল হল কাল সাপ, অবাধ্যই তার দংশন বাঁচাই চলবি—ধনা কি মনে করত? নিশ্চয়ই ভাবত, বাপ-খুড়োরা বড্ড অমঙ্গল ভাবে, ডাকে। ওরা—

আহারে! কাল কত তাড়াতাড়ি বদলাতিছে। ছুঁতি পারি তার সাধ্য কি।

২

ভুবনের বংশোবস্তীর ভিটে হাতছাড়া হয়েছিল শ্বশুরবাড়ীতে পাকাপাকি জমে বসতেই। সেজন্যে শেষদিকে ভুবনের ক্ষোভ ছিল। সে ক্ষোভের আঁচ বহুবার ধনারও গায়ে লেগেছে। তেতে উঠলেই বলত, এ-তো তোর মা-দিদিমার ভিটে, আমি ত ছাড়িদার বই না! আমার বলতে আছে কি ক'? ওখানে হিসাব মশায়দের তাঁবে, এখেনে তোর মা-দিদিমার। ধনারে! আমি তোরে কিছু ধরে দিতে পারি নাই বাপ, আমারে—

ধনা প্রাণপন করেছিল বাপ বেঁচে থাকতে কিছু করতে। নিদেন একটি ভিটে কিনতে।

পায়েনি। তল্প পুঁজির দোকানের টাকা যদি জমিতে পোঁতে তাহলে দোকান লাটে উঠবে। দোকান লাটে তুলে ভিটের স্বাদ—না বাপ, সে হবে নাই। পরাণ থাকতি না।

বাপ মরার বছর দুয়ের মধ্যেই ভিটে কিনেছে ধনা। ঘর তুলেছে, এমন কি কেটেছে ছোট্ট পুকুরও। অবশ্যই মামার বাড়ীর গাঁয়ে নয়, মশায়দের আশেপাশেও নয়, মুখোমুখি গাঁয়ে। পোটেক দূরে।

ঠিক করেছিল মাকে নিয়ে পা রাখবে ও-ভিটেয়। চপলারও অমত ছিল না। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি থাকলে শিল-নোড়ায়ও লাগে। নিজের মায়ের সঙ্গে ত নিত্যি অবনিবনা। কে চায় ক্ষণেক্ষণে খিটিমিটির, যদি নিজের পেটের ছেলে উপযুক্ত, সম্পন্ন।

চপলা এক পা বাড়িয়ে ছিল, কিন্তু—

বললে, আগে তুই বিয়ের পিঁড়িতে বস্। একা একা ভিটা জাগাব বাপ সে হবে নাই।

সে কি! আমার বলি মরার ফুরসৎ নাই। আমি—

ও বললি কি হয় ধন। ফুরসৎ না থাকে করি নিতি লাগবে। বয়স কারুর জন্যি বসে থাকে না বাপ, হাটবারে হাট করতি হয়, এই-ই নিয়ম।

অগত্যা একই লগ্নে দিদিমার বাড়ীতেই ধনা-শ্যামার বিয়ে হয়ে গেল। শ্যামার বউ রইল দিদিমার বাড়ী, ধনা মাকে-বউকে নিয়ে এল নতুন ভিটেয়।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ধনার বউ মা হল, ধনা বাপ। জমি হল, ফলের বাগান, এমন কি জন খাটানো লাঙলের চাষও। ছেলের মুখে ভাতের নাম করে আশপাশের গাঁ-গেরামের মানুষকে এক বেলা মাছে-ভাতে ভর পেট খাইয়েও দিলে। চাদ্দিকে জয় জয়কার।

মানুষের এত ত্বরিৎ হয়ে ওঠার চেহারা গ্রামের মানুষের অভিজ্ঞতা নয়। ছপ্পর ফুঁড়ে ধন সে ত গালগপ্প। বরং ওদের অভিজ্ঞতার হাত ধরা—কারো কারো গাঁয়ের বাস তুলে অন্য গাঁয়ে হারিয়ে যাওয়া, অথবা দায়ে পড়ে পাট চুকিয়ে সরে পড়া। এই সব চেনা মানুষের যাওয়া যে দুঃখজনক, সে যে মন খারাপের মতো মর্মান্তিক, তা আর বলতে! তবে সে আর ক'দ্দিন! তখন সান্ত্বনা, এ সংসারে কি-ই বা চিরদিনের! কে-ই বা অমর! অতএব—

কিন্তু এই বছর কয়েকের ফারাকে এমন মাটি ফুঁড়ে বেড় ছাড়ানো গাছ—হায়রে বিধি! কি নিধিই না দেখালে! —দিনে আনা দিনে খাওয়া, হাভাতে বৈদ্যির শেষ বয়সের পুত কিনা ডাকাবুকো সওদাগর! ছিল নাই কড়ি, এখন কিনা ন'কড়ি! মরি যাই! মরি যাই! মহশায়দের দপদপানি এর কাছে কিছু না, কিচ্ছু না! এতো জনের পাতে মাছ-ভাত!

তবু মরা হাতী লাখ টাকা। না ডুবুক হাঁটু, ভরে থাক কাদা-আগাছায়, তবু মজা দীঘিও দীঘি!—ধনা গলখন্দে মশায়দের মান্যিতা দিলে, গড় করলে জনে জনে। বললে,

বাপ আমার আপনাদের আশ্রয়ে ছিল, আমিও আপনাদের পায়ের কাছে ঠাঁই নিলাম, আপদে-বিপদে আপনারা আছেন, ঠেলে দিবেন না এই মিনতি।

ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। আহা রে! এমনটি আর কখনো ঘটিছে? না হে না। ধনের তাপ বড় তাপ হে! সে পোড়ায়, পোড়ে। তার দাপও বড় অল্প না। তবু দেখ, দেখ, নম্রতা দেখ, বিনয় দেখ। দেখ কেমন বাঁকিতেছে, ভাঙতিছে। গুমোর নাই, গরিমা নাই—এমনটি না হলি ভগবান দশহাতি দেন।

হোক। বাড়-বাড়ন্ত হোক!

o

দিনে দিনে ধনার বাড়-বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। ধন যথেচ্ছ হাঁক পাড়তেছে।

o

শ্যামার হাতে গঞ্জের লোকনারীর হাল ধরিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিনের পোষা বাসনার হাত ধরে ধনা আরো ধনের সন্ধানে পাড়ি জমালে শহরে।

যাবার কালে মা শুধলে, কবে নাগাদ ফিরবি ধনা? আমি তোর পথের দিকে তাকাই কাল কাটাব। মারে ভুলিস নাই বাপ। তুই আমার বড় সাধের, আমার খালি কোলের আলো। তোরে ছাড়া—

বউ শুধলে, অভাগীরে মনে রাখবা তো? যদি আমারে ভুলিও যাও, তোমার সোনার চাঁদেরে ভুলবা না। ফিরাই শুনবা তোমারে 'বাপ' 'বাপ' বলি ডাকতিছি।

ধনা তথা ধনপতির আকাঙ্ক্ষা তখনো দেশ গাঁয়ের মাটি ছুঁয়ে। ছলো ছলো-চোখে শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় বললে, যুৎ না হলিই ফিরব। মন আমার এইখানেই পড়ি রইল। না ফিরি সাধ্যি কি! তবে হ্যাঁ, আমার দিব্যি আমার শ্রীমন্তরে চোখে চোখে রাখবা। ফিরি যেন দেখি—কথা জড়িয়ে গেল। শেষ কথা শোনা গেল না।

তাড়াতাড়ি ফিরিস্ বাপ।

মিছামিছি দেরী করবা নাই।

o

আর ফিরেছে॥

৩

তবে দিব্যচক্ষু কৃষ্ণ দেন অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘবর্ণ শীর্ষ তার পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তার বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥

ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধু সম তার পৃষ্ঠ বসুময়।
দশদিক জঙ্ঘা তার পাতাল চরণ।
শৈলগণ তার অস্থি লোম তরুগণ ॥
মাংসরূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময় ॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ বিশাল সংসার ॥

গ্রামে-গঞ্জে বেড়ে ওঠা ধনপতির কাছে গোরাদের গড়া শহর যেন অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। চাকার উপরে দোল খাওয়া বাড়ী থেকে ভীড় ঠেলে নামা তক্ বিস্ময় আর বিস্ময়। চাদ্দিক জুড়ে এ কি ইলাহী কাণ্ডকারখানা। ঝকঝকে তক্‌তকে রাস্তা, চকচকে পাল্কি, জুড়িগাড়ী, হৈ চৈ, হাঁক ডাক, গমগম ভিড়ভাট্টা, ইটের ঘর-বাড়ী, প্রাসাদ, দোকান-পাট, গ্যাসের আলো, সিপাহী, শান্ত্রী, গোরা-কালা—ডাইনে পা বাড়ালে বাঁয়ে ভয়, বাঁয়ে পা বাড়ালে ডাইনে—কোনদিকে যাই ? যাব ?

o

দিশেহারা ধনপতি অবশ্যই এ শহরে আড়ত করবে।

o

দিন কয়েক শহর মোটামুটি সড়গড় হলে ধনপতি আড়তদারীর বড় রকমের আস্তানা খুঁজে পেল। গঞ্জে শ্যামাকে জানিয়ে দিলে, মোকামে দাদন দিতে লোকে পাঠালে। জুৎ হয়ে বসতে না বসতেই সিদ্ধিদাতা হাত ধরলে ধনপতির, লক্ষ্মী আঁচল বিছালে খুশি মনে। জমে উঠতে দেরী হল না।

o

আকাঙ্ক্ষা বৃক্ষের মগডাল।
বাসনার কি শেষ আছে ?
অনন্ত তৃষ্ণার উপশম ?
না গো, না।
অতএব—
জল পড়ে, পাতা নড়ে।

o

কি নেই এ শহরে ?

লাট-বেলাটের বাড়ী, ইল্ডিং-বিল্ডিং, ডাকঘর-তারঘর, আইন-আদালত-হাইকোর্ট, মুনিসিপালিটি, বড়বাজার-ছোটবাজার, মেছোবাজার-চোরাবাজার, গরুহাটা-মুর্গীহাটা, চাউলপট্টী, ফুলপট্টী, জাহাজঘাটা-লঞ্চঘাটা, পাকারাস্তা-কাঁচারাস্তা, টিনের চালা-মাটির বাড়ি, জুড়ি গাড়ি, হাতি, পাল্কী, এমনকি ভিনদেশী সাহেব-সুবো স্বদেশী বাবু-মুৎসুদ্দীদের দিনেরেতের মদত দিতে সার সার শুঁড়ি বাড়ি, জাঁক করা জমজমাট খানকী পাড়াও। বাঘের চোখ চাই বাঘের চোখ, গণ্ডারের শিং চাই গণ্ডারের শিং,

এমনকি প্রয়োজনে শুয়োরের বাচ্চাও। আছে দশগণ্ডা মায়ের থান, এক কুড়ি মসজিদ, সোয়াগণ্ডা গীর্জে। কবর আছে, দিক জ্বালানো শ্মশানও।
বলো, কি চাই ? অর্থ ? বিত্ত ? প্রতিষ্ঠা ?
আরে শহর মানেই ত আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-স্বপ্ন তাড়িত পাড়মরি ছোটা মানুষের ঠাঁই, লোকারণ্য। তেমন মানুষেরা দিনে দিনে বাড়ছে, বাড়ছেই। ভিড়ে ভিড়েগুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি। ধনপতিও সেই ভীড়ের মানুষ, একে ঠেলে, ওকে ফেলে, ক্রমান্বয় এগোচ্ছে। এগোতে এগোতে—

০

ধনপতির এ শহরে বসত বাড়ী ছিল না ; হল।
চেকনাই জুড়ি গাড়ি ছিল না, কিনল।
ধনহীন কোন কামনা-বাসনা ছিল না ধনপতির, জন্মাল।

০

ধনাঢ্য ধনপতির শহরতলীতে বাগান বাড়ী হল, রঙ্গ-বিলাস হাত ধরল। ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করল, রাখল গুটিকয় মনোমত রাক্ষিতা।
জনসমাজে ধনপতির প্রতিষ্ঠা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল।

০

এ সেই কাল, সেই মনীষা সময়, ধনগর্বী শ্রেষ্ঠী চাইল সামাজিক সম্মান, রাজকীয় শিরোপা—মহারাজা, নিদেন রাজা, নচেৎ প্রিন্স।
ধনা প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে 'রাজা' হল। ধনপতি সওদাগর হল রাজা ধনপতি রায়।
ইতিহাস হাত ধরল ধনপতির ॥

৪

মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

কার এ বিলোল মধুকণ্ঠ ? কে এমন দিক কাঁপানো তরঙ্গিত ডাক দিলে আমায় ? কে অনায়াসে উচ্চারণ করলে 'আবাদ করলে ফলত সোনা'।
কোন পতিত জমিন আমার আবাদে বাকী আছে ? সে কোথায় ?

০

সদ্যরাতে নেশাগ্রস্ত রক্ষিতার সঙ্গে নিদারুণ রমণক্লান্ত উন্মত্ত রাজা ধনপতি মধ্যনিষুপ্তি যামে আচমকা জেগে উঠল। ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় তখনো রঙ্গশয্যা আলোময়। স্পষ্ট দেখল পাশে প্রায় নিরাবরণা বিস্রস্তবাসা অচৈতন্য রঙ্গরমণী, শুকনো পানের

কষ মিয়ানো ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়ানো লালা, কুৎসিৎ ধ্বনিযুক্ত নাত্তটানা নাসিকা শব্দ। ঢলে পড়া দক্ষিণ স্তনবৃন্ত কি বিশ্রী, কালিমাচ্ছন্ন ; নিম্নাঙ্গে চোখ নামাবে কি ফাটাফুটি তলপেটে দৃষ্টি পড়তেই ভীষণ বিবমিষায় চক্ষু মুদল।

হায়রে ! মত্ত মদবিহ্বল মুহূর্তে দালালানীত এই রমণীকে কি মোহিনীই না মনে হয়েছিল। আহা ! যেন সদ্যোস্ফুট পুষ্প, বুঝিবা শুভ্র শিশির স্নাত, অবশ্যই অনাঘ্রাতা। মনে হয়েছিল, এমন নিটোল নিখুঁত দেহবল্লরী বড় বিরল। বিভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গী, হাস্য আশ্চর্য রসোদ্রেককারী, উত্তেজক, মদির, অথচ অমলিন, নির্মল। এমন কামিনীরত্নলাভসৌভাগ্যে মনে হয়েছিল ধন্য। মনে হয়েছিল, ছার ওই স্বর্গীয়া রম্ভা বা উর্বশী !

উফ ! এ কি মিথ্যা মায়া ! ছলনা ! এমন মতিভ্রমও মানুষে সম্ভব ?

হায়রে ! মুখোশসর্বস্বা রমনী !

ঘৃণা উচ্চারিত সর্বাবয়বে। ক্লেদ ! ক্লেদ ! ধিক্ তোর পাশব ভোগাকাঙ্ক্ষায়। ছিঃ !

কিন্তু—

রমণী ত অঘোর ঘুমে ! ও ত অচৈতন্য !

তাহলে আমার মগ্ন চৈতন্যে কে এমন ঝাঁকুনি দিলে ? কে জাগালে আমার এই গাঢ় মধ্য রজনীতে ? কে অমন সাবলীল বললে, 'আবাদ করলে ফলত সোনা' ? কে ? তাছাড়া পতিত জমিন কোথায় ? কোন দেশে ? আর কোন আবাদে সোনা ফলত ? ফলবে ?

এ কী আমার গূঢ় গোপন অনন্ত সুবর্ণ স্পৃহা ? এ কী আরো ধনবাঞ্ছা ? না, না, এ—

অমানুষিক পরিশ্রমে, অন্তহীন কূটবুদ্ধিতে, নিরন্তর ছল-ছলনায় অমিত ধনাঢ্য ধনপতি বিশ্বাস করে এই বিশাল জগতের একজন অধীশ্বর অবশ্যই আছেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জোড়া আদ্যন্ত কর্মকাণ্ড তাঁরই অনন্ত লীলা। সন্দেহ নেই তিনিই সেই মহাযন্ত্রী এবং তিনিই এই নিঝুম মধ্যযামে তাকে—

বিদ্যাশিক্ষার পাঠশালার পাঠ ধনপতির স্বল্প, কিন্তু সংসার কর্মযজ্ঞশালার সে অতিদক্ষ, অতিনিপুণ একজন যে ইতিমধ্যে বিত্তার্জনই শুধু করেনি, ভোগে-সুখেও পটু, তদুপরি বহুদর্শনে-শ্রবণে, নিত্য বিচিত্র মনুষ্য সংসর্গে বিজ্ঞতাও অর্জন করেছে অঢেল, শিক্ষিত হয়েছে আচারে-আচরণে-ব্যবহারে, বাকচর্চার কুশলতাও অনায়াসায়ত্ত, তবুও তার এ মুহূর্তে মনে হল এখনো অনেক আস্বাদন তার হয়নি, আরো কর্ম তার করার অপেক্ষায়। নচেৎ সেই সেদিন, বন্ধুর শবদাহ উপলক্ষে শ্মশানদর্শনে শ্মশান-বৈরাগ্যে আক্রান্ত তার উদ্দেশ্যে শ্মশানচারী সেই পক্ককেশ সন্ন্যাসী অমন অমোঘ উচ্চারণ করবেন কেন ? কেন তাকে উদ্দেশ করেই বলবেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত !!

ধনপতি সেই মধ্যযামেই ঘুমন্ত কোচোয়ানকে জাগিয়ে আদেশ দিলেন গাড়ীতে ঘোড়া জুততে। পলকে নিজের অসংবৃত পোষাক ঠিক করে দেয়াল জোড়া দর্পণে

নিজেকে আপাদমস্তক বিম্বিত দেখে ঘৃণায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আচমকা অবিন্যস্ত পাগড়ী ঠিক করেই মনে হল, কি লাভ দর্পণে বিম্বিত প্রতিবিম্ব দর্শনে ? কি হবে ? দর্পণে বিম্বিত সে কি আমি ? এই আমি ? নাহ্ ! অতএব, দ্রুত পদক্ষেপে গাড়ীতে আরোহণ করে আদেশ দিলেন, নদী তীরবর্তী নির্জনে নিয়ে চলো।

এ মুহূর্তে নির্জনতাই তার কাম্য। সে বুঝতে চায়, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চায় কোন সেই মানবজমিনের মহৎ আবাদে আরো সোনা ফলবে ? সে জমিন কোথায় ? কতদূরে ?

o

নিশাবসান প্রায়। অনেকক্ষণ নির্জনে ক্ষয় করেও কোন উদ্দেশ্য সাধিত হল না কেউ বলল না কোথায় সে জমিন ? কেউ হদিশ দিল না, কতদূরে তার অবস্থান ? মর্মাহত রাজা ধনপতি রায় স্থির করল, যতদূরেই হোক, সে সেই পতিত জমি উদ্ধার করবেই। তাকে করতেই হবে। অতএব উত্তিষ্ঠতঃ।

জাগ্রত রাজা ধনপতি উঠে দাঁড়াল। প্রয়োজনীয় দিনানুদৈনিক কর্মের যথাযথ নির্দেশ কর্মচারীদের দিয়েই তাকে অবিলম্বে যাত্রা করতে হবে।

শুভ কাজে বিলম্ব রাজস্বভাব হওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব—

o

রে মুসাফির ! আগী বাড়ো, তুরন্ত বাড়ো, সুরিয়া হেল রাহা হৈ !

৫

কমবখত্ উহো কৌন, মুহো পর আঁখে রাখতি হৈ ! হঠ যা ! আভি যা !

উষালগ্নে মালিকের এমন আগমন অভাবিত। এ যেন উন্মত্ত উন্মাদ কেউ। যে যেদিকে পারল সরে দাঁড়াল।

o

আদেশ নির্দেশ শেষ হলে, রাজা ধনপতি দ্রুত চলায় তার গোপন কুঠুরীতে প্রবেশ করল। রজনীর রাজবেশ খুলে পাজামা-পাঞ্জাবী পরে অনাচ্ছাদিত মস্তকে একটি মাত্র ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে এল। হাসি মুখে জনে জনে বললে, ঈশ্বর তাকে ডেকেছেন, সে ডাকে তিনি চললেন, সময় হলেই তিনি ফিরে আসবেন, এখন যেন কেউ তার খোঁজ-খবর করে বিরক্ত না করেন।

o

পার্ষদদের কেউ কেউ ভাবলে, এ ভ্রমণ নিশ্চয় রহস্যজনক ; নিশ্চয়ই মর্মান্তিক কোন স্খলন-পতন কারো ঘটেছে, আসলে সেই-রহস্যোদ্ঘাটন মানসে এই ছদ্মযাত্রা। অতএব, সাধু সাবধান !

কর্মচারীরা ভয়ে কাঁপছে। এমন কি দ্বিতীয় পত্নীও। তার ভয় কোন অসতর্ক পদক্ষেপ কি কর্তার গোচরীভূত ? কৈ মনে ত হয় না। তবু ভয়ে, ভাবনায় মুসড়ে পড়ল। মনে হল, এখন থেকে আরো সতর্ক থাকতে হবে, সজাগ। কারণ, নিকট-জনের যাওয়া-আসা ত জানা. কিন্তু যে জনু চোখের আড়াল তার গতিবিধি, নজর, তার—

O

এক ঢিলে অনেকগুলো পাখী কাবু করা গেল। রাজা ধনপতি রায়ের অজ্ঞাতবাসে যাত্রা এখন নিশ্চিন্ত। ধনপতি কিয়দ্দূর পদব্রজে গিয়ে স্বজন ও স্বপোষ্যদের আড়াল হতেই ভাড়ার গাড়িতে উঠে বসল। শহরতলীর কোন স্টেশান থেকেই সে—
না, তার আগে দিনকয় কোন ধর্মশালায় কাটাবে, নচেৎ সরাই খানায়। না তার চেয়ে ভাল হয় যদি দূরগামী কোনো নৌকোয় চেপে বসে। না, যদ্দূর গাড়ী যায় যাক, তারপর পদব্রজে—
দেশ-দর্শন ত শিক্ষার-ই অঙ্গ। কিন্তু শুধু দেশ-দর্শনে কালক্ষয় ! না, না। তাহলে আমার 'আবাদ' ?
আচ্ছা, 'আবাদে'র গূঢ়ার্থ আবিষ্কারও ত শিক্ষাই। তাহলে—

আবাদে চলিলা ধনপতি ॥

[দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত]

তৃতীয় পর্ব ❦ পিতৃ অন্বেষণে শ্রীমন্ত

১

পিতৃ আজ্ঞা পালনে রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন ; আমার অসহায়া মাতার সকরুণ মিনতিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি অবশেষে পিতৃ অন্বেষণে বাহির হইয়াছি।

জন্মাবধি পিতৃসন্দর্শন হয় নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। অবশ্যই আমি পিতাকে দেখিয়াছি—এক বৎসর বয়স্ক শিশু যেই ভাবে দেখে ঠিক সেইভাবেই। নিশ্চয়ই তখন পিতার স্নেহ ও কোল আমি লাভ করিয়াছি। শুনিয়াছি, আমার কর্মক্লান্ত পিতা গৃহপ্রত্যাবর্তনান্তে আমাকে না দেখিলেই অধৈর্য হইয়া পড়িতেন। আমার সামান্যতম অস্বস্তিও পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইত ; তিনি বাড়ি মাথায় করিতেন। এমন কথাও শুনিয়াছি, বাণিজ্যযাত্রার পূর্বে তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, আমার শ্রীমন্তের যেন বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়। ফিরিয়া যেন দেখি, সে—

হতভাগিনী মাতার অনন্ত স্নেহ আমি পাইয়াছি। প্রায় বৃদ্ধা পিতামহীর অশেষ প্রীতিও। কিছু কিছু পাড়া-প্রতিবেশীও আমার প্রতি নিরতিশয় স্নেহপ্রবণ ছিলেন। শৈশবে যে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত তাহার প্রতি করুণাময় তথা মমতাময় হওয়াই স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য, দুর্মুখেরাও সংখ্যায় স্বল্প ছিলেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাব দোষে অথবা সংস্কারবশে আমার মন্দভাগিনী মাতার অশেষ নিন্দামন্দ করিতেন ; আমার দুর্ভাগ্যকে তিরস্কার।

এই সংসারে দুঃখকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে নাই ; তাহাতে দুঃখের অবসান না না হইয়া বৃদ্ধিই ঘটে। তাই আমি এই নাতিঅল্প বয়সেই সুখকথা স্মরণ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ঠাওরাইয়াছি। ফল মন্দ হয় নাই। বিজ্ঞজনেরাও পুঁথিপত্রে এমত উপদেশ-ই রাখিয়াছেন। আমার নষ্টভাগ্য জননী কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এককড়া দুঃখকে সাতকাহন করিতে ভালবাসেন। তিনি অনন্ত দুঃখে নিজেকে আদ্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া নিরতিশয় তৃপ্তি পান। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, নিরন্তর দুঃখ-ভাবনাও কাহারও কাহারও সবিশেষ সুখের কারণ। নির্দ্বিধায় বলি, এমন দুঃখ-ভাবনাজনিত সুখাকাঙ্ক্ষীরা এই সংসারে স্বল্প নহেন।

২

জীবন ও জগত সম্পর্কে ঊনবিংশতি বর্ষীয় গ্রাম্য যুবকের অভিজ্ঞতা নিতান্তই মামুলী। দেখাশোনার জগতটাই এত ক্ষুদ্র যে গ্রামগণ্ডী পার হইতেই অপরিচয়জনিত ভয় কুণ্ডলী পাকাইয়া হৃৎপিণ্ড গ্রাস করিল, ক্রমে শ্বাসনালী। মনে হইল, ভয়ে দমবন্ধ হইয়া যাইবে। নাহ্, দমবন্ধ হইল না বটে, কিন্তু নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইল। নিতান্তই মাতৃ অনুজ্ঞা, আমি মরিয়া হইয়া শহরে পা রাখিলাম।

৩

পৌরাণিক স্বর্গকল্পনা নানাবিধ পুরাণ পাঠে কিঞ্চিৎ আয়ত্ব করিয়াছিলাম। জানি, লাস্যময়ী রমণীয় রমণী স্বর্গে সুলভ ; সুলভ রসস্নিগ্ধ স্বাদু ফল-মূলও। মোহময় পুষ্পোদ্যান ত যত্রতত্র, দেবদুর্লভ কান্তিযুক্ত মনুষ্যরাও। স্নান-পান বিশ্রাম ত আছেই, যথেচ্ছ সঙ্গসুখও দুর্লভ নহে। তদুপরি স্বর্গীয় বস্তু মাত্রেই সুবর্ণাচ্ছাদিত ; ঝলকে ঝলকে ইতি-উতি ঝলসিত মণি-মুক্তা-মাণিক্য। অর্থাৎ লোভমোহলাঞ্ছিত হিরণ্যগর্ভ মানব-কামনার চূড়ান্ত অস্তিত্ব স্বর্গ। শহর অবশ্যই সেই পৌরাণিক কল্পনা বিলাসের পরিপূরক নহে, তবে সদ্য বয়োপ্রাপ্ত গ্রাম্য যুবকের নিকট প্রায় সমতুল।

আমি শহরকে প্রায় স্বর্গ বাসিলাম।

এতো বিচিত্র মনুষ্য, এতো রকমারী প্রাসাদ, এতো দীর্ঘ সড়ক, আঁকাবাঁকা অলিগলি, এতো রঙীন গাড়ীঘোড়া-আলো, এতো ছন্দোময় চলমানতা—বিস্ময়বিমূঢ় আমি নিতান্ত বাকরহিতাবস্থায় নদী তীরবর্তী এক শিলাসনে বসিয়া পড়িলাম। কোথায় যাইব, কোথায় যাইতে হইবে তথা হয়, কিছুই জানা নাই ; শুধু কম্পিত বক্ষ জুড়িয়া অপরিমেয় সান্ত্বনা এই যে, শহরে আসিয়াছি। মাতৃ আজ্ঞা যথাযথ পালিত হইয়াছে।

৩

বেলা বাড়িতেছে। নদী তীরবর্তী ঘাটসমূহও ক্রমে লোকারণ্য। এতো নারী-পুরুষ ! আমার মন্দাকিনী মেলার কথা স্মরণ হইল। এই নদী কি মন্দাকিনী ?

অতিকষ্টে জানিলাম এই নদী মন্দাকিনী নহে ; এই নদী স্বর্গ হইতে মর্তে আসে নাই ; তবু এই নদী পবিত্র। এর স্নানে পুণ্য, পানে অক্ষয় স্বর্গলাভ।

স্বর্গেও স্বর্গ বাঞ্ছা ! আমার নিতান্তই বিমূঢ়াবস্থা। ঘোর কাটিতেই দেখি, সম্মুখে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বৃদ্ধা। পক্ক কেশ, লোলচর্ম, কিন্তু রক্তোজ্জ্বল অঙ্গরঙ—মনে হইল, এই বৃদ্ধা অবশ্যই সম্ভ্রান্ত গৃহিনী, আমার মাতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শুধাইলেন, বাছার নিবাস ?

আমি স্বচ্ছন্দে গ্রামের নাম বলিলাম।

তোমার পিতা ?

আমি অবলীলায় পিতৃনাম উচ্চারণ করিলাম।

বৃদ্ধা চকিতে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণে দেখিলাম অদূরে ততোধিক রক্তোজ্জ্বলা মধ্যবয়সী এক মহিলা অন্তহীন কৌতূহলে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

মহিলা বৃদ্ধার পশ্চাৎ দৃষ্টিতে কম্পিতা হইলেন। শির সঞ্চালনে বুঝিলাম দুইজনে স্থির নিশ্চয়। মহিলা পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া শুধাইলেন, কোথায় যাইবে? তাঁহার স্থির দৃষ্টি আমাকে সত্যোচ্চারণে বাধ্য করিল।

মহিলা বলিলেন, মা, উহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।

আমি অসঙ্কোচে উঁহাদের সঙ্গী হইলাম। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইল।

৪

নিতান্ত কৃতজ্ঞতা বশেই উঁহাদের কৌতূহল নিবারণে আমি বাধ্য হইলাম। আদ্যোপান্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করিলাম। অসঙ্কোচে বলিলাম আমার শহরাগমণের কারণ। বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা চুক্ চুক্ শব্দে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, বাছা, তোমার পিতার সন্ধানে আমরা যৎপরোনাস্তি অবশ্যই করিব, তবে কতটুকু কৃতকার্য হইব তাহা ঈশ্বরই জানেন!

তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি আমাকে চমকিত করিল। কারণ আমি ইতোমধ্যে বুঝিয়াছি তাঁহারা সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন গৃহিণী নহেন, তাঁহারা বাজারী রমণী মাত্র, অর্থাৎ বারবণিতা।

৫

কথাসূত্রে জানিতে পারিলাম, আমারই মুখের আদলযুক্ত জনৈক মহাশয় ব্যক্তির দৌলতে এককালে তাহারা সাতিশয় সুখমুখ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বিধায় কন্যাদেশে বাধ্য হইয়া আমাকে এইখানে স্থান দিয়াছেন। আমার অন্যতর চমকের অবকাশ ছিল না যেহেতু বৃদ্ধার কন্যা প্রায় আমার মাতৃসমা। তিনিও আমাকে পুত্রবৎ দেখিতেছেন ইহা উপলব্ধি করিতে আমার বিলম্ব হইল না। বুঝিলাম, কোনো গূঢ় জটিল প্রীতিমোহপাশে তিনি বাঁধা, দীর্ঘকাল পার হওয়া সত্বেও স্মৃতিভারে তিনি বিড়ম্বিতা, আমামধ্যে হয়তবা সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। টের পাইলাম, মধ্যরাত্রে আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুসিক্ত মমতায় আমাকে অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া। যে-ই বুঝিতে পারিলেন আমি জাগিয়া গিয়াছি, অমনি মুখ অঞ্চলে ঢাকিয়া পালাইয়া গেলেন। মৃদু আর্তনাদ চৌকাঠে আটকাইয়া গেল। আপন জননীস্বভাব আমার সবিশেষ জ্ঞাত বলিয়া মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অস্পষ্ট রহিল না। বুঝিলাম, অন্যতর মূল্যে আমি এখানে গৃহীত। উপার্জনহীন শহরবাসের ভয় ঘুচিল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, ঈশ্বর বিমুখ করেন না।

শহরে যথার্থ মানুষের সঠিক ঠিকানা পাওয়াই শক্ত। এত লোকারণ্যে কে যে কোথায় সিঁধাইয়া আছে কে নির্ণয় করিবে? বৃদ্ধা আমাকে সুবালা নাম্নী এক রমণীর হদিশ দিলেন। বলিলেন, আমার অনুমান উহার কাছে তুমি হয়ত কিঞ্চিৎ জানিতে পারিবে।

আমি এই অনুমানের কারণ সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রশ্ন করিতেই তিনি কিঞ্চিৎ রুক্ষভাবে জানাইলেন, অতশতে তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার হদিশ দরকার, আমি সূত্র দিলাম।

ইহাঁদের সমৃদ্ধ নারীত্বের পরিচয় এই ক'দিনেই আমি পাইয়াছি। আমি দিনের কথাই বলিতেছি। রাত্রির পরিচয় আমার জানিবার নহে; কৌতূহলও নাই। তবে জীবিকার্জনের উপায়ের মাত্রাধিক অশালীনতা ও অবাঞ্ছিত বেদনা আছে আমি টের পাইয়াছি। রুক্ষতা যে তজ্জনিত তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুবালার সন্ধানে চলিলাম। কিভাবে আদৃত হইব ভগবানই জানেন। তবে আমি অকপট থাকিব স্থির করিলাম; যদিও মাতৃস্থানীয়া মহিলা, যাঁহার নাম ললিতা, যিনি বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা, যাত্রাকালে সন্তর্পণে বলিলেন, ভুলেও আমাদের কথা বলিও না। তুমি উপস্থিত হইলে অবশ্যই উপস্থিতির কারণ বুঝিতে পারিবে।

মহিলা আত্মগোপনেচ্ছার রহস্য কি?

সুবালা সুন্দরী নহেন, রঙও ফর্সা নহে। তবে তাঁহার দুই চক্ষু অতুলনীয়। এমন লাবণ্যময় দৃষ্টি আমি আর দেখি নাই। কণ্ঠস্বরও অপূর্ব!

অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া যখন একটি নাতিবৃহৎ প্রসাদদ্বারে উপস্থিত হইলাম তখন অভর্থনা করিল এক দাসী। সে বারম্বার আমার মুখের উপরে চোখ রাখিতেছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। সে কি ভাবিয়া সঠিক জানি না একেবারে গৃহকর্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিল। মহিলা চমকিত তাকাইলেন। শুধাইলেন, কে তোমাকে আমার ঠিকানা দিয়াছে।

আমি অকপটে সব বলিতেই তিনি স্মিত হাসিলেন। আপন মনে বলিলেন, ললিতার এখনো রাগ পড়ে নাই। ভাল! আমার দিকে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, বহুদিন আগেই আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, আমি তোমাকে সঠিক কোন সাহায্য করিতে পারিব না, তবে তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, তুমি ভবর সহিত সাক্ষাৎ কর, সে অবশ্যই বলিতে পারিবে।

ভব নারী কি পুরুষ—পুরা নাম শুধাইব কি শুধাইব না, তিনি দাসীকে ডাকাইয়া কাগজ কলম দিতে বলিলেন। অনিন্দ্য হস্তাক্ষরে লিখিলেন:

ভবসিন্ধু মায়া, চোরবাগান, তিন নম্বর গলি।

মুখে বলিলেন, তোমার পিতার নাম বলিবার প্রয়োজন নাই, ওই নামে তাহাকে

আমাদের এলাকার কেহই চিনিবে না। তোমার মুখই তোমার পিতৃ পরিচয়, তুমি উপস্থিত হইয়া তোমার পিতার সন্ধান চাহিবে। ব্যস্। এখন আসিতে পার।
আমি কথা না বাড়াইয়া পা বাড়াইলাম। মজা এই, মহিলা আমাকে সারাক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন।

৬

ভবসিন্ধু বাবুর বয়স হইলেও ভদ্রলোক অতিমাত্রায় রসিক। রস যে এখনো গড়াইয়া পড়িতেছে তহাতে সন্দেহ নাই। বয়স উপেক্ষা করিয়াই মস্করা করিলেন। বলিলেন, আর পাঁচ সাত দশটি বছর বাড়াইতে পারিলে ললিতা অবশ্যই শয্যা সঙ্গী করিত, সুবালার মুখামৃত রসাস্বাদেও বঞ্চিত হইতে না।
আমি লজ্জায় মস্তক অবনত করিলাম।
গ্রামজীবনে রসিকা রমণীসান্নিধ্য লাভ করি নাই ঠিকই, সমবয়সী কি কিঞ্চিৎ ছোট বালিকা বা সদ্যোযুবতীর সঙ্গ পাইয়াছি, সুখও হাত ফসকায় নাই। অতএব নিজেকে একেবারে অনভিজ্ঞ বলিতে পারি না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ইত্যাদি পাঠে কাম সম্পর্কে অনতিস্পষ্ট জ্ঞানও হইয়াছে, সমবয়সী বালিকা-যুবতীরাও কিঞ্চিৎ ইন্ধন যোগাইয়াছে, কিন্তু মেয়েমানুষ এমন আকাঙ্ক্ষিত তাহা বুঝি নাই। বৃদ্ধের রসালাপে 'বঞ্চিত হইয়াছি' এমন একটি ক্ষোভের প্রকাশ ছিল। আমি সবিনয়ে বলিলাম, ওঁরা আমার মাতৃস্থানীয়া, আমি পিতৃ অন্বেষণে আপনার নিকট আসিয়াছি।
অহো! ভবসিন্ধুবাবু রসের ঢেঁকুর তুলিলেন। বলিলেন, দেবলোকে বাছবিচার করিতে নাই। তুমি নিশ্চয়ই মহাভারত পাঠ করিয়াছ, উর্বশী জানিয়া বুঝিয়াই অর্জুনকে কামনা করিয়াছিলেন। প্রার্থনা পুরণ না হইতেই অমোঘ অভিশাপ। জানো ত, রমণভিখারী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করিলে রৌরব নামক নরকে পতিত হইতে হয়।
আমি চোখ তুলিতে পারিতেছি না। ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখিয়া আরো উচ্চগ্রামে সুরু করিলেন। পিতার্জিত অর্থ-বিত্ত ঘর-বাড়ি যদি অবলীলায় ভোগ করিতে পার তবে পিতৃ রক্ষিতায় অরুচি হইবে কেন? পৈতৃক ঘোড়া থাকিলে কি মাঠে ছাড়িয়া দিতে, নাকি অন্যকে বিলাইয়া দিতে? চাপিতে না?
অসহ্য! উঠিব কি উঠিব না ইতস্তত করিতেছি, উনি হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, এক কালে অনেক গলাগলি ঢলাঢলি করিয়াছি, দীর্ঘকাল যদিও সম্পর্ক ছিন্ন তবু তোমাকে বলিতেছি, সম্মুখের ভাত অগ্রাহ্য করিতে নাই।
আমি এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উনি ততক্ষণে রক্তচক্ষু। এ তো আস্পর্ধা। বসো। বসো।
আমি সভায় বসিয়া পড়িলাম।

তোমার পিতাও আমার সমক্ষে এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশে সাহসী হয় নাই। তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি। অবশ্য এক্ষণে তুমি আমার কাঠামো মাত্র দেখিতেছ, মাংস-মজ্জা খসিয়া গিয়াছে। গবাক্ষ পথে দেখো, যদ্দূর দেখিতেছ সবই আমার ছিল, এক্ষণে এই কক্ষে আমি আশ্রিত। সবই ওই কামস্বর্গে হারাইয়াছি, নচেৎ তোমাকে বহুদিবস আমার দ্বারে আমাদর্শনে ধর্ণা দিতে হইত। তা ও বা কেন, তোমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি তুমি অবশ্যই পাইতে। এক্ষণে বন্ধুপুত্র হিসাবে ক্ষমা করিলাম।

আমি তাঁহার মুখে চোখ রাখিলাম। মনে হইল, সেই উৎফুল্ল ভদ্রলোক উধাও, একজন জীর্ণ-শীর্ণ বয়স্ক লোক আমার সম্মুখে।

আমি সবিনয়ে শুধাইলাম, আপনি কি আমার পিতার খোঁজ রাখেন?

ভদ্রলোক অনতিস্পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, তুমি বৃথাই খোঁজ করিতেছ, তিনি নিরুদ্দেশ।

আমি বজ্রপতনজনিত শব্দ শুনিলাম।

তিনি বলিলেন, অদ্য তুমি যাও, দিন কয় পরে আসিও; আমি সম্ভাব্য বার্তা তোমাকে দিব।

আমি পদধূলি গ্রহণ করিব কি করিব না দ্বিধাগ্রস্ততায় যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তিনি বলিলেন, আমি কাহারও প্রণাম গ্রহণ করি না, তুমি যাইতে পার।

৭

'পিতা নিরুদ্দেশ' এই মর্মান্তিক বার্তা আমাকে এত বিচলিত করিয়াছিল যে পিতার সর্বশেষ ঠিকানার হদিশ লইতে আমি ভুলিয়া গেলাম। ফিরিয়া গিয়া শুধাইবার সাহস অবশিষ্ট নাই। পিতৃ বন্ধুর যে পরিচয় জ্ঞাত হইলাম পিতার স্বরূপ জানিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। আমি কিয়ৎকাল সড়কের এমুড়ো ওমুড়ো চক্কর দিলাম, শেষে ঠিক করিলাম, সুবালার কাছেই ফিরিয়া যাইব; শুধাইব, ভবসিন্ধুবাবুর ন্যায় পিতার আর কোন অন্তরঙ্গজনের খবর তাহার কাছে আছে কিনা?

মনস্থির করিতে বিলম্ব হইতেছিল। ভবসিন্ধুবাবু রম্যারমণী সম্পর্কে যে উক্তিসমূহ করিয়াছেন তাহার পরে সেই রমণীদের সাহায্যপ্রার্থী, আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার ঔচিতানুচিন্ত্য ভাবিতেছিলাম; এক বয়স্ক ভদ্রলোক শুধাইলেন, এ পাড়ায় কোথায় আসিয়াছিলেন? এমন অপরিচিত ব্যক্তির অযাচিত প্রশ্নে বিরতবোধ স্বাভাবিক। আমি শুধাইলাম, আপনার প্রয়োজন?

ভদ্রলোক সামান্য সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, মনে হইল আপনি মাসী বাড়িতেই গিয়াছিলেন। বাহির হইয়াও এলাকা ত্যাগ করিতেছে না—সন্দেহ হইল আপনি বিপদাপন্ন। সহানুভূতি হৃদয় দ্রব করে। 'আপনি বিপদাপন্ন' ভদ্রলোকের এই আনুমানিক উচ্চারণে আমি ভাঙিয়া পড়িলাম। বলিলাম, পিতার হদিশ পাইতে ভবসিন্ধুবাবুর কাছে আসিয়াছিলাম।

হদিশ পাইয়াছেন ?

নাহ্।

না পাওয়াই স্বাভাবিক। পিতার সঠিক হদিশ আদ্যাবধি কেহ কি পাইয়াছে ?

মহা মুশকিল। আমি ভদ্রলোকের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলাম। নাহ্, পাগল অবশ্যই নহে, তাহা হইলে ?

ভদ্রলোক বলিলেন, পিতা নানান প্রকার। জন্মদাতা পিতা ভিন্নও ভয়ত্রাতা, আশ্রয়দাতা—

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, থামুন। আমি জন্মদাতা পিতার সন্ধানে আসিয়াছি।

ভদ্রলোক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তুমি সঠিক জান যাঁহার সন্ধান করিতেছ তিনিই তোমার জন্মদাতা পিতা ?

মাতৃ চরিত্র সম্পর্কিত এমন সন্দেহজনক উক্তি—ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, অতিকষ্টে নিজেকে সামলাইলাম। এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে শুধু বাক্যই নহে, শব্দ মাত্রও গূঢ় অর্থ বহন করে! এ কোন কাল যখন শব্দ এত তাৎপর্যবহনকারী!

আমি কথা ঘুরাইবার জন্য শুধাইলাম, আপনি কি ভবসিন্ধু বাবুকে চেনেন ?

ভবসিন্ধুকে চিনিব না! এ জীবন ত ভবসিন্ধুর কুলকিনারা খুঁজিতেই চলিয়া পড়িল। বাবাজীবন উহাঁর কিনারা কেহই পান নাই, সবাই সাঁতার কাটিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে—আবার সেই অট্টহাসি।

লোক জমিয়া যায় দেখিয়া আমি বলিলাম, আরেকদিন কথা হইবে, আজ চলিলাম।

উনি বলিলেন, চার নম্বর গলিতেই আমার বাস। নাম নবনীগোপাল মুখুজ্যে, কেষ্টবাবুও বলিতে পার।

আমি চকিতে মুখ তুলিলাম। নামে ও ডাক নামে কি আশ্চর্য সামঞ্জস্য!

৮

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে দাঁড়াইয়া যখন পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেছি মনে হইতেছে যখন পাইবার অথবা হারাইবার কিছুই নাই তখন কি প্রয়োজন ছিল স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝামাঝির কিছুকে টানিয়া জড়ো করিয়া। কি লাভ ? খুটি-নাটির সব ত এখন স্মরণে থাকিবার কথা নহে, কাল অবশ্যই নির্বাচন করিয়াছে, ঝরতি-পড়তি ঝরাইয়া ফেলিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা তাহার যে সবটুকুই সত্য কে বলিবে ? মনও ত গড়িয়া লইতে পারে—তাহা হইলে ?

কাল দ্রুত গড়াইয়া চলিয়াছে। বিগত দিনের বীজ ইতিমধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, সতেজ বৃক্ষ হইয়া ফলন্ত হইয়াছে। উহার স্বাদুতা সম্পর্কে আমি সম্যক অবগতি নহি, দেখিতেছি সর্বত্রই গৃহীত হইতেছে, ভয় সেই খানেই। বলিতে পারেন, নিতান্ত ভয়ার্ত হইয়া স্বকালের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। কাহার কাজে লাগিবে জানি না, সংসারধর্ম মানি নাই, পালাইয়াছি। কাজে লাগুক বা না লাগুক নিজের যন্ত্রণাকে

প্রকাশ করিবার অধিকার অবশ্যই আমার আছে ; আপনকালের স্বরূপ নিজে চিনিবার ও অন্যকে চিনাইবার দায়ও—আসলে জীবন নামক মহাভার বহন করিতেছি বলিয়াই দায়। জীবনের দায়বদ্ধতাজনিত যন্ত্রনাই, বলিতে পারি, বাধ্য করিতেছে।

শুনিয়াছি, কেষ্টবাবু উন্মাদ নহেন, তবে উন্মাদপ্রায়। এককালে ভবসিন্ধুবাবুর সাগরেদী করিয়াছেন, এখন উদাসীন। সম্পন্ন অভিজাত মুখুজ্জে পরিবারের সন্তান হইয়া হালে জাতে ওঠা বিত্তবান মান্নাবাবুর সাগরেদী পরিবারের লোকে ভাল চোখে দেখেন নাই ; সামাজিক সম্মানেরও ক্ষতি হইয়াছে। কেষ্টবাবুর মতে উহা ঠিক নহে। শহরে ওই সব জাতি-পাতি অধর্তব্য। এই প্রগতিশীল মানসিকতা সেইকালে লোকমান্যতা পাইয়াছিল। তাতিয়া মাতিয়া কেষ্টবাবু উপবীতও ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাহবার ঝড় বহিয়াছিল। বাহবাকে নিত্যপ্রাপ্তিব যোগ্য করিতে হইলে যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগ প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়া কেষ্টবাবুর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইল না, ক্রমে লোকস্মৃতি হইতে মুছিয়া গেলেন—এই মর্মান্তিক বিষাদেই তাঁহার এই উদাসীনতা, তাঁহার বাতুল বাচালতা।

দিন তিনেক পরে কেষ্টবাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া পুনর্বার ভবসিন্ধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া নিরতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আমার কাছে তোমার প্রয়োজন ?

আমি যথারীতি আমার পূর্ববক্তব্য পুনরুচ্চারণ করিলাম। স্মরণ করাইয়া দিলাম, আপনি কথা দিয়াছিলেন সম্ভাব্য বার্তা অবশ্যই আমাকে দিবেন।

কথা দিয়াছিলাম ? বার্তা দিব ? তিনি কিয়ৎকাল স্থির থাকিয়া হাসিয়া শুধাইলেন, কা চ বার্তা ?

আমি চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—

মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কাল পচতীতি বার্তা।

বুঝিলে না ? শোনো, কাল সূর্যরূপ অনলে রাত্রিন্দিব (দিন-রাত্রি) স্বরূপ ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে (কড়াই) ঋতু ও মাস স্বরূপ দর্বী (হাতা) পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করিতেছে, ইহাই বার্তা।

আমার মনে পড়িল—

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্তা॥

হাসিব না কাঁদিব, না কি রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে আপন কেশোত্তোলন করিব, বলিলাম, আমি রহস্য শুনিতে আসি নাই।

নিশ্চয় জ্ঞান লাভ বাঞ্ছা করিয়া—

আপনার ?—আপনাদের নিকট হইতে ?

তুমি কি তোমার পিতৃ বন্ধুকে অধঃপতিত কেহ ভাবিতেছ ?
অসম্ভব ! কার্যোদ্ধারের বিন্দুমাত্র আশা নাই। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। কোথায় যাইব, কাহার কাছে যাইব। সবিনয়ে বলিলাম, আপনি কি সত্যই পিতার সম্পর্কে কিছু বলিবেন ?
পিতা ? তুমি কি ঈশ্বরের কথা বলিতেছ ?
বুঝিলাম, কালগ্রাসিত অবস্থা। আরো অবস্থান অবশ্যই সর্বনাশা হইবে। আমি দ্রুত সোপান বাহিয়া ছুটিলাম। পশ্চাতে বিকট অট্টহাসি আমাকে ধাওয়া করিল ; সামনেই কেষ্টবাবু। শুধাইলেন, কোথায় পালাইতেছ ? বলিয়াই ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হইযা গাহিতে লাগিলেন—

পালাইবার পথ নাই ভাই
যম আছে পিছে।

দিন কয় পরে শুনিলাম ভবসিন্ধুবাবুর ভবলীলা তঁার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিনই সাঙ্গ হইয়াছে। শবদেহ দুইদিন ঘরে পড়িয়াছিল। শেষে—

০

কেষ্টবাবু আমার কোন কাজে আসিলেন না। হস্তধৃত সূত্র আমার ভাগ্য দোষে ছিন্ন হইল। জুড়িব তাহার কোন উপায় আর অবশিষ্ট নাই। আমি নিকটবর্তী হইয়াও দূরত্ব ঘুচাইতে সক্ষম হইলাম না। সবই বিফলে গেল।

৯

বসন্তের কাল কখন ফুরাইয়াছে জানিতেও পারি নাই। আনমনে পথ হঁাটিতে হাঁটিতে একদিন চোখে পড়িল পথিপার্শ্ব লাল-হলুদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। চোখ তুলিতেই কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া। তবে বৈশাখ ! মুহূর্তে রৌদ্রতাপ মস্তকোপরি অনুভব করিলাম, শরীরও তেজাচ্ছন্ন হইল। আমি ছায়ার সান্ত্বনা খুঁজিতে পা বাড়াইলাম। কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া আমাকে আশ্রয় দিল।
শহরে সঠিক বসন্ত আসে কিনা আমার জানা নাই। হয়ত আসে, হয়ত আসে না। হয়ত এখানে কাহারও বর্ষব্যাপী বসন্ত, কাহারও আদ্যন্ত খরা।
বলাবাহুল্য, আমি খরাতাড়িত।

নিতান্ত ছেলেমানুষী আদর্শগত কারণে ললিতার আশ্রয়ে ফিরিয়া যাই নাই, সুবালা সম্পর্কও ঘৃণ্য মনে হইয়াছিল, ফলে ভবসিন্ধু বাবুর সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতের পূর্ববর্তী তিন দিন আমি এক ধর্মশালায় বাস করি। সাক্ষাৎ পরবর্তী কালে নিরুপায় যখন পথে পথে ঘুরিতেছি তখন দয়ার্দ্র হৃদয় এক বদান্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বৈকালিক ভ্রমণান্তে পার্কের বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন, নিতান্ত কৌতূহলবশতঃ প্রশ্ন করিতে করিতে যখন জানিলেন আমি আশ্রয়হীন, তিনি আশ্রয়ের উপায় বাতলাইয়া

দিলেন। বলিলেন, মুড়োসাঁকোর মধুমল্লিকের বাড়িতে লোকের প্রয়োজন, তুমি চেষ্টা করতে পার। এবং কপর্দকহীন আমাকে একটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া বলিলেন, আমার এই-ই দিন বরাদ্দ, তোমার কাজে লাগিলে বড়ই বাধিত হইব।
দান যখন ভিক্ষা রূপে নহে, দাতার প্রীতি উপহার হিসাবে আসে তখন তাহা গ্রহণে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তির। আমি সানন্দে, সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। উঁহার আনন্দ ও সন্তুষ্টি অধরা রহিল না। আমি সঠিক নির্দেশ জানিয়া যাত্রা করিব, উনি বলিলেন, মধুমল্লিকের সাক্ষাৎ অবশ্যই তুমি পাইবে না, তবে রাধারমণ—মল্লিকবাড়ীর সরকারবাবু, তাঁহার মুখোমুখী অবশ্যই হইবে। তাহাকে বলিও, বিলাস দত্ত তোমাকে পাঠাইয়াছেন। একটু থামিয়া বলিলেন, ভবসিন্ধুবাবু যে তোমার পিতৃবন্ধু এই কথা অসংকোচে জানাইও; তাহাতে তোমার-ই সুবিধা হইবে। আমি বিলাসবাবুর পদধুলি লইয়া পা বাড়াইলাম।

o

মল্লিক বাড়িতে কাজ হইল।

১০

সদর-অন্দর, অতিথিশালা, ভৃত্যশালা, দাসী-আবাস, ঠাকুরঘর, ভোগঘর, ব্রাহ্মণাবাস, অনাথভবন ইত্যাদি লইয়া বৃহৎ প্রাসাদপুরী। প্রাসাদপুরীর মধ্যস্থলে ছড়ানো পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষরাজী। উদ্যান মধ্যে ইতি-উতি সুদর্শনা, সুদেহী মর্মর মূর্তি,—কেহ দেহভঙ্গিমা প্রকাশোদ্যত, কেহ দেহরহস্য; কেহ কেলিরত, কেহ শুধুবা দর্শিকা। বড় আগ্রহ সৃষ্টিকারী মূর্তিসমূহ, তবে কেহই স্বদেশীয়-স্বদেশীয়া নহে, রাজবংশীয়। বুঝিলাম, শাসক-সংস্কৃতিতে শহর, শহরবাসী গ্রাসিত। আসবাবপত্র হইতে পোষাক-আষাক, রুচি, এমনকি মূর্তি, উপাদানও আমদানীকৃত। অবশ্য খাদ্যাখাদ্য পাঁচ মিশেল। বৈদিক-মোগলাই-সাহেবী সবের-ই খিচুড়ি। ঐ সমস্ত খাদ্য স্বীয় জিহ্বাস্বাদন হইয়াছে—মিথ্যা; আমি দূর হইতে চাক্ষুস করিয়াছি এইমাত্র—যেমন মধু মল্লিককে দূর হইতে দেখিয়াছি। যেমন আকাশ দেখি, সূর্য, চন্দ্র, তারা।
আমার অবস্থা নিতান্ত দাসানুদাসদের কিঞ্চিৎ উপরে; সরকারতন্ত্রের বেশ নীচে। ফলে সদরেও ডাক পড়ে, অন্দরের আমন্ত্রণও দুর্লভ নহে। দুদিক সামলাইতে যদিও প্রাণান্ত, যদিও আমি বড়-বাড়ীর মূলজনেদের কেহ নহি, তবুও আঁচ বাঁচাইতে পারিয়াছি, তাহা নহে। পূর্ণ সিদ্ধ হই নাই বটে, তবে অর্ধপক্ক হইতেই হইয়াছে; রেহাই পাই নাই। আসলে গৃহকর্তারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে গৃহ ও গৃহস্থ সমস্ত বস্তু ও প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণের দায় গৃহভৃত্যদের-ই। এই-ই মোদ্দা। অর্থাৎ বড় বাড়ীর কাণ্ডকারখানা, বড় রকমের; কেচ্ছাকিচ্ছিরও রকম ছোট নহে। সেই সমস্ত এতই সুবিদিত যে সাতকাহন করিয়া বলা বৃথা। অবশ্য কেচ্ছাপিয়াসী জনের কাছে তাহা মুখরোচক হইত বটে, তাহা তাহাদের কাম্যও সন্দেহ নাই, আমি কিন্তু কেচ্ছাবিলাস লিখিতে লেখনী ধরি নাই। বাসনা—স্বকালের জ্বালা ও যন্ত্রণাকে স্পষ্ট করিব। অতএব, আগে কহ আর।

ধনার্জনের এত পথ আছে গ্রাম্য আমার আদপেই জানা ছিল না। আমার ধারণা ছিল 'বিষয়ে বসতে লক্ষ্মী'। কিন্তু বেশ্যা বসাইয়া ধনার্জন, এবং সেই ধনে দান ব্রত ও পুণ্যার্জন,—অবশ্যই অর্থের কোন জাত নাই! অর্থ এমন-ই শুদ্ধ বস্তু যে মনুষ্য মলযুক্ত হইলেও তাহার সচলতা ব্যাহত হয় না। আমি শহুরে ধনার্জন রহস্যে মগ্ন হইলাম। মরিলাম। ছিঃ ছিক্কারে ধিঃ ধিক্কারে আমি অচিরেই ফাটাফাটি হইয়া গেলাম। দেখিলাম, চতুর্দিকে সব, সমস্তই, খাদ্য ও খাদ্যকে রূপান্তরিত হইয়াছে। মনে হইল, আমি এক মহারণ্যে বাস করিতেছি; চতুর্দিকে ক্ষুধার্ত পশুরা শুধু খাদ্য অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। এবং মনে হইল, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শিকার। ছল দ্বারা, চাতুরী দ্বারা, মায়া,মোহ ও মমতা দ্বারা—অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ শিকারকে কাবু ও বধই আশু লক্ষ্য।

আমি অসহায়বোধে নিতান্ত পীড়িত হইলাম। কিন্তু নিরুপায়।

পালাইবার পথ নাই ভাই
যম আছে পিছে।

জীবন নামক ভয়ঙ্কর মোহময় বস্তুটা রহিয়াছে, মাতৃআদেশ নামক দায়বদ্ধতা রহিয়াছে, পিতৃবন্ধু-বান্ধবী দর্শনে বিস্মিত চমকিত আমার পিতাকে চাক্ষুষ করিবার নিতান্ত দুর্লোভও রহিয়াছে, অতএব—

১১

নানান ধরনের টাকা আমাকে আহরণ করিতে হয়। খাজনার টাকা, ভাড়ার টাকা, কিস্তির টাকা, সুদের টাকা, ধারের টাকা, দক্ষিণার টাকা, টাকা টাকা টাকা—দেহজাত পণ্যজাত, পুণ্যজাত—

বাবুদের কি নাই! দুই দুইটা বেশ্যা পল্লী, আঠারটি আড়ত, তেরটি গদী, বাইশটি মন্দির, শতাধিক ভাড়া বাড়ী, নয়টি বস্তী, তিনটি বাহারী দালালী অফিস, চার পরগণার জমিদারী, মোকামে পাইকার—সে এক ইলাহী বন্দোবস্ত! দেশে-গাঁয়ে ঘুণি বসাইয়া মাছ ধরিবার কায়দার কথা মনে পড়িল। যেদিকেই জল চলিতেছে সেদিকেই ঘুণি; মাছের পালাইবার উপায় মাত্র নাই। জলে চড়িয়া বেড়াইতেছ ঠিক আছে, অন্যত্র যাইবার বাসনাতাড়িত হইয়াছ কি মরিয়াছ। ফাঁদে পড়িতেই হইবে।

প্রাসাদ নগরীর দিকে তাকাইয়া ভাবি, এত অন্তহীন ফাঁদ সত্ত্বেও মানুষ এইখানে বাঁচিয়া আছে কি করিয়া? এই প্রশ্ন একদিন রাধারমণ বাবুকে হাস্য-পরিহাস মুহূর্তে শুধাইয়াছিলাম। তিনি পলকে গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, অমৃতস্য পুত্রাঃ বলিয়া।

আমি অন্যতর প্রশ্ন করিবার সাহস পাই নাই।

১২

এইখানেই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর গত হইল। মাতার সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্নই রহিয়াছে, কিন্তু পিতার যথার্থ হদিশ এখনো অধরা। নিরুপায় আরো দিন গত হইলে শহরবাসে প্রায় প্রবীণ ও পাকা হইতে চলিলাম।

১৩

বড়র সাহচর্যের মজা এই যে আরো বড়োর সংস্পর্শে আসা সহজ হয়। বলাবাহুল্য পারিবারিক সম্পর্কই তাহার একমাত্র কারণ নহে; সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কও আছে।

আমি শহরের তাবৎ ধনীজনের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইলাম। জানিলাম, ইহাদের উপার্জিত অর্থ মুখ্যতঃ ভোগে ব্যয়িত হইলেও ভোগোদ্বৃত্ত অর্থ নানান সামাজিক সংগঠনেও নিয়মিত নিয়োজিত হয়। এই সৎ নিয়োগজনিত পুণ্য এমন ঢাক-ঢোল সহযোগে প্রচারিত হয় যে পাপস্পর্শজনিত জনরব ছাপা অক্ষরের তলায় বেমালুম চাপা পড়িয়া যায়।

এইখানেই আমি হঠাৎ মহামান্ত ধনপতি রায়ের সম্পর্কিত জনশ্রুতি ও বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় তৎলিখিত ও তৎ সম্পর্কে লিখিত প্রচুর দলিলাদির সম্মুখীন হইলাম। জানিলাম, এই মহাত্মা প্রচণ্ড পরিশ্রমে শুধুমাত্র বিত্তার্জন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বহুবিদ বিদ্যা তথা জ্ঞানার্জন করিয়া বহুভাবে বহু ভাষায় নিজের অর্জিত জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধিকে ক্রমান্বয় প্রকাশ করিতেছেন; অথচ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন না।

পিতার নামের সহিত তাঁহার নামের মিলজনিত কারণে আগেই তাঁহার লীলাবিলাসের কিঞ্চিৎ সংবাদ আমার জ্ঞানগত হইয়াছে, কিন্তু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ হদিশ সম্ভব হয় নাই। সূত্র ধরিতেই পাঁচ পাঁচটি বৎসর গত হইল। আমি পুনর্বার ধনপতি রায়ের নামের নিকটবর্তী হইলাম; মধু মল্লিকের এস্টেটের ন্যস্ত কর্ম ও দায় মাথায় উঠিল। রাধারমণ বাবু বারংবার ধিক্কার উচ্চারণ করিলেন, অকথ্যও বলিতে ছাড়িলেন না—কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। আপন ঘায়ের জ্বালায় কুকুর পাগল ত, পাহারা দিবার দায়পালন ঘাড়ে পড়িয়া রহিল। আমি ধনপতি সংবাদের জন্য মরীয়া হইয়া উঠিলাম।

১৪

কষ্ট করিলে কেষ্ট মেলে। আমারও মিলিল। একটি পরগণার খাজনা দিবার জরুরী প্রয়োজনে দলিল-দস্তাবেজ সহ একবার রাধারমণবাবুর সঙ্গী হইলাম। তহশীলদারের সাক্ষাৎ পাইতেই আমাদের বিলম্ব হইল। ফলে বাধ্যতামূলক রাত্রিবাস। রাধারমণ

বাবু তাঁহার এক আত্মীয় বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। আমাকে সঙ্গী হইতে বলিয়াছিলেন বটে, আমি রাজী হইলাম না। দলিল-দস্তাবেজ লইয়া আমি আমাদের-ই কাছারীবাড়ীর বহির্মহলে আশ্রয় লইলাম। সেখানের নায়েব কেশব সরকারের সঙ্গ পরিচয় হইল।

কেশব সরকার বেশ বয়স্ক লোক, অনেক ঘাটের জল খাইয়া বিগত পাঁচ বৎসর এইখানে নায়েবগিরি করিতেছেন। আমি সন্ধ্যার মুখোমুখী সেইখানে পেঁছিলাম। জলখাবার খাইয়াছি, আসল খানাপিনার অনেক বিলম্ব। কেশববাবু সময় হরণ প্রয়োজনে স্মৃতিচারণে রত হইলেন। নিরুপায় আমাকে শ্রোতার ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইল। একঘেয়ে সেই বক্তব্যে ক্লান্ত-শ্রান্ত আমার ঢুলুনী আসিতেছিল হঠাৎ ধনপতি রায়ের নামে আমি উৎকর্ণ হইলাম। একঘেয়েমি ঘুচিল। আমি মুখ তুলিলাম।

আপনি ধনপতি রায়ের আড়তে খাতা লিখিতেন ?

খাতা লিখিতাম কি, বাবাজীবন, আমিই তাহার দক্ষিণহস্ত ছিলাম।

তাহার দেশ ?

উহা বলিতে পারিব না, তবে শ্যামা বলিয়া তাহার এক সম্পর্কে মাতুল কোন এক মোকামে থাকিত, সেই মোকামের নিকটবর্তী কোন দূর গ্রামে তাহাদের বসত ছিল।

তিনি কি প্রথমাবধিই রায় ?

ছোঃ ছোঃ, আদিতে সওদাগর লিখিত, সম্পন্ন হইতেই রায়।

শিক্ষা দীক্ষা ? কেশব সরকার বুড়ো আঙ্গুল দেখাইয়া মুখে বলিলেন, ঘেচু ! তবে হ্যাঁ, জানিবার-বুঝিবার বড়ই আগ্রহ ছিল। সেই জন্যেই ত আড়ত উঠাইয়া গোরা সাহেবের মোসাহেবীতে মজিল। ফল খারাপ হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই জমিদারী কিনিলেন ; নুনমহাল।

তখন আপনি ?

বাবাজীবন, আগেই ত বলিয়াছি, দক্ষিণহস্ত ছিলাম।

যথা ?

ভদ্রলোক মুখ তুলিলেন। মৃৎ প্রদীপের মৃদু আলোয় যতটুকু দেখা যায়, দেখিলাম, তাঁহার স্বাভাবিক দৃষ্টি ক্রমে ক্রূর, কঠিন হইতেছে। তিনি আমার মুখে চোখ রাখিলেন। হয়ত ভাবিতেছেন, অপক্ক এই যুবার এত কৌতূহল কেন ? তিনি নড়িয়া বসিলেন। বুঝিলাম, তিনি সঠিক আন্দাজ করিতে পারিতেছেন না। আমিও সতর্ক হইলাম। তবে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কারণ বিগত কয়েক মাসের শশ্রুগুম্ফে আমার আসল মুখাবয়ব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে ; ধরা পড়িবার সম্ভাবনা প্রায়-ই নাই। তবে তীক্ষ্ণধী লোক, অনেক ঘাটের জল খাওয়াও বটে। শুধাইলেন, তুমি কি তাহার সম্পর্কে কিছু জান ?

স্বচ্ছন্দে বলিলাম, ইদানীং তাহার কিছু লেখালেখি পত্র-পত্রিকায় পড়িয়াছি।

লেখালেখি ? কেশব সরকার বিস্ময়ে বিমূঢ়। ধনা রায় লিখিতেছেন ?

আজ্ঞে, তাঁহার নামে প্রচারিত হইতেছে।

প্রসঙ্গ ?

হিন্দুর দেব-দেবী, ঈশ্বরের একত্ব, ইংরেজ আগমনের সুফল, খৃষ্টের মহত্ত্ব, ইসলামে সাম্য.........

কেশব সরকারের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। মনে হইল, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও দ্রুত হইতেছে। শুধাইলাম, আপনি কি অস্বস্তিবোধ করিতেছেন?

বাবাজীবন, স্বস্তিও বোধ করিতেছি না।

কারণ?

কেশব সরকার ধীর ধৈর্যে কালপরিবর্তন সম্পর্কে কিছু মোক্ষম উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, ভাগ্য! ভাগ্য! ভাগ্য মানুষকে কোথায় না তাড়াইয়া লইয়া যায়। এই অধমকে দেখো, অধঃপতিত হইতে হইতে এইখানে, আর ধনা, ধনপতি—

উনি ইদানীং মহামতি মহাত্মাও বটেন! আমি আলতো উস্‌কাইয়া দিলাম।

উফ্‌, মাগীবাজ এখন মহাত্মা! আচমকা উচ্চারণ করিয়া জিভ কাটিলেন। ভিতর বাড়ী হইতে খাবারের ডাক পড়িল। উনি চকিতে সচেতন হইলেন। তাহা হইলে ওঠা যাক্‌।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই মুহূর্তে আরো আলোচনা স্বাস্থ্যকর নাও হইতে পারে। কিন্তু—

চুলায় যাউক। সূত্র ত হাতে আসিয়াছে। অদ্য না হউক, আগামী কল্য, পরশু; ...উহুঁ, এক্ষণে পেটে ছুঁচো ডন মারিতেছে, এক্ষণে—

তাহা হইলে চলুন।

পাশাপাশি আসন গ্রহণ করিলাম। কেশব সরকার আহারকালে মৌনাবলম্বী।

১৫

রাত্রিতে আলাপের অবকাশ ছিল না। সরকার গৃহিনী কর্তাকে বহির্বাটিতে আসিতেই দিলেন না। পরদিবস অতি প্রত্যুষে গাড়ী হাঁকাইয়া রাধারমণবাবু হাজির। খাজনা মিটাইবার ঝামেলায় বেলা বাড়িল, ফলাহারেই দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ইতি।

আমরা ফিরিয়া চলিলাম।

শহরে ফিরিয়াই কেশববাবুকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পত্র দিলাম। জানাইলাম, তাঁহার প্রাজ্ঞ সাহচর্যে সেই রাত্রিবাস বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছিল, এবং এই ক্ষণসাক্ষাৎ আমরণ স্মরণে থাকিবে।

পত্রোত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না। তিনি পুনর্বার আমার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গেলে তাঁহার সুখও অফুরন্ত হইবে ইহা জানাইতেও ভুল করিলেন না। বুঝিলাম, স্মৃতি যথার্থ শ্রোতার মুখাপেক্ষী। আমি কালহরণ করিলাম না। দেশগাঁয়ে যাইবার আছিলায় পুনর্বার কেশব সরকারের মুখোমুখী হইলাম।

১৬

কেশব সরকারের সদ্যোযুবতী কন্যা আছে আমি জানিতাম না। গতবারে আমি

দেখি নাই। দেখিবার উপায়ও ছিল না। তাহা ছাড়া কেশববাবুর সংসার সম্পর্কে আমি কোন কৌতূহল প্রকাশ করি নাই, উনিও গরজ করেন নাই।

এইবারে কেশববাবুর ছড়ানো সংসার চোখে পড়িল। পুত্র, কন্যা, পরিজনে ভরা-ভর্তি সংসার। তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, অবশিষ্ট দুই কন্যার বড়টি সদ্যো-যুবতী, সুন্দরীও। চার পুত্রের বড়টি সেরেস্তায় বসিতেছে, তাহার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ। পরবর্তী তিনটির দুইটি পাঠশালায় যাওয়া-আসা করিতেছে; ছোটটির বয়স বছরচারেক। শুনিলাম সরকার গৃহিনী অন্তঃস্বত্বা।
সন্দেহ কি, এই বয়সেও কেশববাবু ক্ষমতাবান!
কথা প্রসঙ্গে কেশববাবু বলিলেন, বছর বছর আবাদ হইলে জমিদারীর পয়সা পাহাড় গড়িত, কিন্তু পতিতের ঠেলায় তাহা হইবার জো নাই।
রায়ত বসাইলেই পারেন। অথবা বর্গাদার।

বাবাজীবন, বলিতে সোজা বটে, কিন্তু কাজ তত সহজ নহে। বাছবিচার না করিয়া কিছু করিবার উপায় নাই। তদুপরি বাবুদের মতলব, খাসে রাখিবার লোভ সামলানো শক্ত। সব্বাই ভিখিরী রাজা কিনা! কিন্তু নায়েবেরও ত দুই হাত দুই পা; খাজনার ঠেলা সামলাইব, না, আবাদের হেপা পোহাইব?
প্রসঙ্গ ফিরাইলাম। শুধাইলাম, ধনপতি রায়ের জমিদারীও কি মল্লিকদের মতই বিশাল।
তিনি হাসিয়া বলিলেন, মল্লিকরা ত চুনোপুঁটি। চন্দন পাহাড়ের কাছে ছাগলের ধান খাওয়া।
এতো?
নইলে অতো মাগী পুষিতে পারিত? বলিয়াই জিভ কাটিলেন, বড্ড অবাচ্য উচ্চারণ করিয়াছি, ক্ষমা করিও।
না, না, যাহা সত্য—

না বাবাজীবন, সত্য হইলেও অপ্রিয়। জানো ত, অপ্রিয় বলিতে নাই।
কে আর শুনিতেছে। শুনিলেও উঁহার কিছুই হইবে না। বলা বাক্য হইতে ছাপা বাক্যের গুরুত্ব ও মূল্য অধিক।

সে আর বলিতে! তাহা ছাড়া আমার মত সামান্য নায়েবের সত্য উচ্চারণে তাহার একটি কেশও উৎপাটিত হইবে না জানি; বরং লোকে বলিবে, অক্ষমের আস্পর্ধা দেখো। শুধুই কু দেখিতেছে। নিমকহারাম!
আপনি কি অনেক নিমক খাইয়াছেন? সারল্যে দগদগে প্রশ্ন ছুঁড়িয়া মারিলাম।
শুধু কি খাইয়াছি, নিমক তৈয়ারীও করিয়াছি; ঝাল-মশলা মিশাইয়াছি; স্বহস্তে পাক পরিবেশন করিয়াছি—

এত সত্বেও আপনি—
উহাই নিয়ম। আদিকে হঠাইয়া দিতে হয়, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়, না হইলে গন্ধ ছড়াইবার সম্ভাবনা অধিক।
তারপরও ত ভয় থাকিয়া যায়।

যায় বটে, তবে ক্ষমতাবান হিসাব করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন। এমন অপবাদ চাপাইয়া দেন যে মুখ তুলিবার উপায় মাত্র থাকে না ত গলা বাড়াইয়া বলিব সাধ্য কি ?

আপনাকে ?

তহবিল তছরুপের দায়ে নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়াছেন।

তারপরও মধু মল্লিকের জমিদারীতে—আমি কথা শেষ করিবার আগেই বলিলেন, বাবাজীবন, শেয়ানে শেয়ান চেনে, চোরে চেনে চোর। আমি কি কে, মধু মল্লিকের অজানিত ছিল না ; অপবাদ ওনারা গ্রাহ্য না করিয়াই কাজে বহাল করিলেন, তবে শহরে নয়, পরগণায়। চক্ষু লজ্জা বলিয়া—

কাকে ?

ধনপতিকে।

উনি জানিতেন ?

বড়দের কারবার-সারবার বড়দের অজানা থাকে না।

তবু—আমি উৎকণ্ঠিত তাকাইলাম।

বাবাজীবন বড় বোকা। আমি যে বিবেক হারাই নাই উহা মধুবাবুরা জানিতেন। দায়ে পড়িয়া আমাকে গলাধাক্কা—তাহাও। কিন্তু অভিজ্ঞ লোক কি হাটে-ঘাটে চরিতেছে ?

যদি সব গুহ্য সংবাদ জানাইয়া দেন।

মধুবাবু জানিতেন উহার উপায় নাই। তাছাড়া বড়লোকী কলঙ্ক বড়লোকের অজানা থাকে না। বরং তাঁহারাই চাপা দিতে তৎপর থাকেন, যদি চরম বিবাদ না ঘটে। তাছাড়া এতবড় অপবাদ স্কন্দোপরি! অতএব—কাজ উদ্ধার করিতে ছেঁটো অভিজ্ঞই প্রশস্ত।

প্রসঙ্গ অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছে। বলিলাম, শুনিয়াছি ধনপতিবাবু অজ্ঞাতবাস হইতেই সমস্ত করিতেছেন। গত চৌদ্দ বৎসর তাহাকে কেহ চাক্ষুষ করেন নাই।

বটে! বটে! কোন শালা বলিতেছে ?

জনরব তাহাই।

রাখো জন। আমিই বলিতেছি, যমুনানগর আর নতুন গ্রামের মাঝামাঝি সোনার-পুরের বাগান বাড়ীতে খোঁজ কর, ধনপতি কেন তাহার রসরসিক সাঙ্গোপাঙ্গদেরও সাক্ষাৎ পাইবে।

উহা ত শহর হইতে মাইল দশেক দূরে।

দূরেই ত। ওই মৌজা বাগানবাড়ীর জন্য আমিই কিনিয়া দিয়াছি।

শুনিয়াছি শহরের বাইরে সব অঘোর জঙ্গল।

হো হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন, মহামতি না মহাত্মা লিখিয়াছে বলিয়াছিলে না ? আগেকার দিনে ঋষি-মহর্ষিরাও জঙ্গলে অথবা গুহায় বাস করিতেন। তাহাতে একনিষ্ঠ তথা বহুনিষ্ঠ ধ্যানের বড়ই সুবিধা। লোকজন নাই বলিয়া লোকাপবাদেরও ভয় থাকে না। সব মতেই সাধনা চলে।

আমি অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইলাম।

বুঝিলে না ?

বুঝিতে কিছু বাকী নাই, তবু তাহার মুখনিসৃত উক্তির স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনিই করুন এই ছলনায় আমি 'না' সূচক মাথা দোলাইলাম।

তিনি বলিলেন, যবনী সংসর্গ লুকাইতেই এই আত্মগোপন।

তাহার স্ত্রী নাই ?

কত স্ত্রী আছে। হঠাৎ কথা থামাইয়া শুধাইলেন, তুমি কি তাহাকে চেন ?

আচমকা প্রশ্নে কাঁপিয়া উঠিলাম। অভিজ্ঞ চক্ষুর নজর এড়াইতে পারিলাম না।

তিনি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাইলেন। মনে হইল দাঁড়-গোফ ঠেলিয়া তিনি আমার মুখের আদল পরখ করিতেছেন। দৃষ্টি ক্রমে তীব্র হইতেছে। এক পা আগাইয়া একেবারে মুখোমুখী।

তুমি কে ?

আমি ভয়ে মস্তক নত করিলাম। তিনি হাত দিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিলেন। তাহা হইলে শ্যামার কথাই সত্যি।

কী-ই ?

সে তার এক ভাগ্নের কথা বলিয়াছিল। তুমি কি সে-ই ?

আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। তিনি আমাকে কাঁপিতে কাঁপিতে ঝাপটাইয়া ধরিলেন। শুধাইলেন, তুমি কি পিতৃ-অন্বেষণে—

আবার সম্মতিসূচক মস্তক হেলাইলাম।

তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাস্তার উপরে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তুমি কি জান আমাকে বল।

আমি যাহা জানিতাম, অকপটে বলিলাম।

তিনি লজ্জিত ও বিমর্ষ। বলিলেন, জিহ্বাদোষে আমি তোমাকে আঘাত করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর। হাজার হোক তোমার জন্মদাত্রা পিতা সম্পর্কে—

আমি কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম, ইদানীং মহৎ পিতার পুত্র বলিয়া আমার অহংকারও ত স্বল্প নহে। আপনি বৃথাই দুঃখ পাইতেছেন।

তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধাইলেন, তুমি কি সত্যই গর্বিত ?

অবশ্য পিতা স্বীকার করিলে।

তিনি নিরাশোচিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, সেই সম্ভাবনা বড়ই অল্প। আদৌ—

তাহা হইলেও পুত্র ত বটে।

অবশ্যই। অবশ্যই। সবার্থেই পুত্র। বিধিবাহিত পুত্র।

প্রান্তর প্রান্তে তখন সূর্য পাটে বসিয়াছে।

১৭

রাত্রিরে কুসুমবালা আমাদের অন্ন পরিবেশন করিল। কেশববাবু সেই সময়ে অকস্মাৎ মৌনতাভঙ্গ করিয়া বলিলেন, এই সব আমার মায়েরই হাতের রান্না। রান্না কি উপাদেয় হয় নাই ?

আমি সহাস্যে বলিলাম, অতুলনীয়। এমন উপাদেয় রান্না দীর্ঘদিন খাই নাই। মায়ের আমার রান্নার হাত ভাল, সেলাই-ফোঁড়াইও তুলনা বিহীন। ওই দেয়ালে টাঙানো সমস্ত কাজই—

আগেই দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। এখন চোখ বুলাইলাম।

'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে,
সংসার ধ্বংস হয় নারীর আগুনে।'

'সতীর পরম ধন পতি
নাহি অন্য গতি।'

'সৃষ্টির আদিতে নারায়ণ
তাঁহারেই ভজ অনুক্ষণ।'

ইত্যাদি অনেক প্রবচন পুষ্প লতাগুল্মের মধ্যে শোভা পাইতেছে।

সানন্দে বলিলাম, অনেক বড় বাড়ী দেখিয়াছি, এমনটি চোখে পড়ে নাই।

সরকার মহাশয় এমত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সানুনয়ে বলিলেন, তবে তুমি কুসুমবালাকে গ্রহণ কর।

আমি বিস্মিত, বিমূঢ়। বলিলাম, এই কথা পরেও হইতে পারে।

যথার্থ! যথার্থ!

কুসুমবালা মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতে আসিয়া আয়ত চক্ষু আমার মুখোপরি মেলিয়া ধরিল। কিয়ৎক্ষণ আমিও চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই। কেশব সরকারের কিছুই অজ্ঞাত রহিল না। আমি সচকিতে সতর্ক হইয়া বলিলাম, এতো ত পারিব না।

কুসুমবালা তেমনি তাকাইয়া অস্ফুটে বলিল, না, সবই খাইতে হইবে।

এ্যাতো!

কুসুমবালা হাসিয়া ফেলিল। কমলার কোঁয়ার মতো কমলারঙ্গী অধর ও মুক্তা-সুন্দর দন্তপংক্তি আমাকে মুগ্ধ করিল। মনে হইল এমন রক্তোজ্জলা শ্রীময়ী যুবতী আমি দেখি নাই।

মধু মল্লিকের অন্তঃপুরেও না?

উঁহারা বড় বেশী ফ্যাকাসে। সে উজ্জলতা কোথায়?

মধু মল্লিকের ছোট পুত্রবধু সরলার?

নাহ্!

মধু মল্লিকের রক্ষিতা আঙুরের?

নাহ্!

দাসী মদনীর? বৃন্দার?

নাহ্!

মধুমল্লিকের চতুর্থপক্ষের তৃতীয়া কন্যা কমলকুমারীর?

না হে নাহ্।

কুসুমবালা আড়চোখে চাহিয়া সরিয়া পড়িল। আমি একরাশ পায়সের সম্মুখে

হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। কেশববাবু বলিলেন, বাবাজীবন, পায়েস পড়িয়া রহিল যে!
না, এই খাইতেছি।

১৮

কেশববাবুকে সবিনয়ে বলিলাম, মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য করিয়া শহরে আসিয়াছি: আগে সেই কার্য সম্পূর্ণ হোক। কথা দিতেছি কার্যোদ্ধার হইলে মাতৃ-অনুমতি লইয়া অবশ্যই আমি কুসুমবালার পাণিগ্রহণ করিব, যদি অপাত্রে কন্যাদানে আপনি রাজী থাকেন।
সে কী! সে কী!
তাহা হইলে আপনি পিতৃসন্দর্শনে আমাকে সাহায্য করুন।
তিনি সানন্দে আমাকে তিনটি হদিশ বাতলাইলেন। বলিলেন, অবশ্যই তুমি কৃতকার্য হইবে।
জলসিক্ত আঁখি কুসুমবালাকে মায়ের আড়ালে স্পষ্ট দেখতে পাইলাম। হৃদয় মুচড়াইয়া উঠিল। দৃষ্টির ভাষা বুঝিবার বয়স অবশ্যই কুসুমবালার হইয়াছে। কুসুমবালাও নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে আমার পুনরাগমন অদূরে নহে।

১৯

কুসুমবালা! কুসুমবালা! সারা পথে পথে একটি নাম, একটি মুখ, একটি শরীর জপিলাম। আহো! কী অপূর্ব দেহবল্লরী, কী সুঠাম ভঙ্গীমা, কী মধুর চলন, বলন। অহো! লাবণ্য গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। হাসির বুঝিবা তুলনা নাই। দন্তপংক্তি কী মনোরম, অধর—আহা—
আমি মনে মনে তাহার অনিন্দ্য শরীর জরিপ করিয়া ফেলিলাম। বক্ষ, স্তন, নাভি, পেট, কোমর, পাছা, উরুত, জানু এমন কি ললিত পদাঙ্গুলিও। যেন ছবি। যদি বিবাহ করি তবে অবশ্যই কুসুমবালা। মনে মনে আলিঙ্গন-চুম্বনও সম্পূর্ণ করিলাম। গাড়ী শহরে আসিল। মূর্তিমান স্বপ্নভঙ্গ!
কোথায় আদিগন্ত সবুজাচ্ছন্ন প্রান্তর, নীলাকাশ, আর কোথায় কঠিন পাথুরে পথ ও প্রাসাদ!

২০

মধু মল্লিকের বাড়ি ঢুকিতেই ছোট বউয়ের এত্তেলা পাইলাম। শুনিলাম, কমল-কুমারীও বার কয়েক খোঁজ করিয়াছে।
আমি গ্রাহ্যই করিলাম না।

বিকেলে ছোট বউয়ের ডবকাদাসী বৃন্দা আসিয়া ঘুম ভাঙাইয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, আস্পর্ধা ত কম নয়! বলি সোনার চাঁদ, এদ্দিন কোথায় গাঢাকা দিয়াছিলে?
বলিলাম, দেশে গিয়াছিলাম।
মিছা কথা মুখে বাধে না! যাও, ছোট বউ তোমাকে ডাকতেছেন।
যাই, বলিয়া উঠিয়া বসিলাম। শুধাইলাম, মিছা কথা কিসের?
গেলেই টের পাইবে।
মানে?
অত জানা নাই বাপু, যাও, ঠেলা সামলাও গে।
বৃন্দা চলিয়া গেল।
কিসের ঠেলা কে জানে। মুখ ধুইয়া পা বাড়াইব, কমলকুমারীর বৃন্দাদাসী বলিল, দিদিমনি ডাকতেছেন।
হঠাৎ?
হঠাৎ হবে কেনে? তিনদিন ধরে গরুখোঁজা খুঁজতিছি, শুনি, বাবু কিনা দেশে গিছেন।
তা দেশে কি আছে বাপু?
বলিলাম, বউ।
বৃন্দা দাসী জিভ কাটিল। বলিল, চোখে চেয়ে মিছা!
আমি হাসিয়া ফেলিলাম।
দেরী করো নাই বাপু। দিদিমনি চাতক পাখীর মতো চেয়ে রয়িছেন।
আচ্ছা! আচ্ছা!
ভাবিলাম, আগে কমল না ছোট বউ?
দেহেমনে কুসুমবালার স্মৃতিজনিত উত্তেজনা ছিল, আমি স্বচ্ছন্দে কমলকুমারীর সম্মুখীন হইলাম। কমলকুমারী পাগলের মতো আদরে আঘাতে আমাকে অবসন্ন করিয়া তুলিল। ছোট বউয়ের সম্মুখে যাইব তাহার উপায় মাত্র রহিল না।

৩

পরদিন চাকরীতে জবাব হইয়া গেল। বৃন্দা বলিল, যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।
আমি চাকরী ছাড়িতামই, ভাগ্যবশে ছোট বউ-ই তাড়াইয়া ছাড়িল। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।
শ্মশ্রু-গুম্ফও যুবাকে রেহাই দেয় না, এই-ই আশ্চর্য!

২১

সত্যর স্বপ্ন নয়! বিগত পাঁচ বছরে বেতন ও উপরির দুই-ই জুটিয়াছে। উপরির জন্য বিবেকক্ষোভের কোন কারণ ঘটে নাই, যেহেতু আমি হাত পাতি নাই। খুসি মনে হাত বাড়াইয়া কেহ দিলে হাত গুটাইয়া লইব এমন আহম্মক আমি নই। তাছাড়া এই শহরবাস কালে আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, গ্রাম্য সততা, শুদ্ধতা শহুরে

তাচ্ছিল্য লাঞ্ছিত হইবেই হইবে। এখানে সততা, শুদ্ধতা সোনার পাথরবাটি, সে হইবার নহে। অতএব, কাজ কি ভান করিয়া? তবে কাজ গুছাইয়া মুখে বাক্যে সত্য আস্ফালন কর, অনেকে বিশ্বাস না করিলেও স্বল্প কয়েকে করিবে; তাহাই লাভ। ভাগ্যে থাকিলে অল্পের প্রচার অনেকের বিশ্বাসের কারণ হইলেও হইতে পারে। তাহাতেই আখের সুবর্ণময়।"

অবশ্যই সুবর্ণময় আখের আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাছাড়া, বাসনা তথা আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই দৃষ্টান্ত তাড়িত, ঈর্ষা প্রণোদিত, ইন্ধন লাঞ্ছিত। শুনিয়াছি, আমার পিতামহ আমার পিতার সাহসের বাখানি করিয়া আমার পিতাকে উসকাইয়া ছিলেন, বলিয়াছিলেন, বদ্যি যদি মাঝি হতি পারে, মাঝির পো কেন সদাগর হতি পারবিনে? বাপরে, সাহসের লাখান আর কিছু নাই। সাহসেই বসতি লক্ষ্মী।

সে সেই গোরাদের আগমনের পরবর্তীকাল। বাঁচিয়া থাকার জন্যে, শান্তিতে থাকার জন্যে, দুই বেলার দুই মুঠোই যথেষ্ট নয়, সে ওই গোরারাই বুঝাইয়া দিয়াছিল। যথেষ্ট হইলে ওরা সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হইয়া এতদূর আসিবে কেন? কেন গাজোয়ারী জমি দখল করিয়া, ভুঁইমাটি তছনছ করিয়া, কুঁচো পাথর ও শাল বল্লার 'পরে লোহা পাতিয়া দেশের এই মুড়ো হইতে ওই মুড়ো সার সার ঘর ছুটাইবে? কেন মাটি খুঁড়িয়া কয়লা বাহির করিবে? কেন ইতি-উতি পাথুরে নগরে পত্তন করিবে? শিল্প? মানুষের ইতিহাস বলীয়ানদের ক্রমান্বয় আগ্রাসনের ইতিহাস—প্রৌঢ় বয়সে আমার এ উপলব্ধী আমাকে বিস্মিত করিল। সে আগ্রাসন শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক হইলে তেমন জ্বালা থাকিত না, কিন্তু সে আগ্রাসন সর্বাঙ্গীন আগ্রাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক—

ধান ভানিতে শিবের গীত কোন কাজের কথা নহে। যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। চাকরী হারাইয়া ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না। অবশ্যি উপরি সুখের আশা ছাড়িতেই হইল। ভালই হইল। ওই সুখে মুখ গুজিয়া কি আমি পাঁচ পাঁচটি বছর মধু মল্লিকের স্বার্থ বাঁচাইয়া ফুরাই নাই? অথচ আমার শহরাগমনের উদ্দেশ্য পিতৃ অন্বেষণ। পিতা চুলায় গেল, আমি বড়োলোকের পোষা ময়নার ছোলা যোগান দিয়া বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়াইলাম, উপরি সুখ হাতাইলাম। নিজের জন্যে নিজে কি ধিক্কার উচ্চারণ করিব—বিগত পাঁচ বছরে শহর আমাকে এমনই গ্রাস করিয়াছে যে কোন বিকার-ই দেখা গেল না, বিবেক জ্বালাও না। আমি 'এই-ই স্বাভাবিক'-এ সান্ত্বনা খুঁজিলাম। কোন দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, আমাকে কাবু করিতে পারিল না।

আমি কেশব সরকারের দেয়া তিন হদিশের প্রথমটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করাই মনস্থ করিলাম। তৎপূর্বে একটি ভালো ঘর যোগাড় করিতে হইবে।

ভাগ্যবলে আমি পুরনো বাজারের ছাদে একটি মনোরম ঘর পাইয়া গেলাম। বিছানা-পত্র পোষাক-আষাক গুছাইয়া রাখিয়া দরজায় তালা মারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্।

বাহ্, আমিও প্রাজ্ঞ হইতেছি!

২২

গুঁইবাগান ধরিয়া গেলে অবশ্যই সহজ হইত, আমি উত্তরদ্বারী হইযা, রেলের লাইন ডিঙাইয়া সেই পোড়ো জমিতে পা রাখিলাম। রেলের বগী লাইন করিতেছে, ইঞ্জিনের ধবকাধবক শুনিতেছি, সিটিও।

এদিকে তেমন প্রশস্ত পথ নাই। সরু পথবেথা আঁকিয়া ঝাঁকিয়া ঝিলতলা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঝিলের উপরে সেতু, লোহার। ঝিলের ওপারে সুসজ্জিত বাগান, বাগান মধ্যে বিশাল প্রাসাদ। সেতু পার হইতেই নেপালী দারোয়ান পথ বোধ করিল। বলিলাম, শ্রীদাম মালীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

শ্রীদাম মালী বাগানেই ছিল। দারোয়ান মালীকে ডাকিতেই মালী খুরপী বাখিয়া উঠিয়া আসিল। আমি হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলাম।

শুধাইল, কোথা হইতে আসা হইতেছে?

মালীবা সাধারণতঃ হরিপুরের মানুষ হয়। বলিলাম, হরিপুর হইতে।

হরিপুবে কোথায়?

আমি স্বচ্ছন্দে বলিলাম, জোত শিবপুরের মৌবীগ্রাম।

মালী মাথা নাড়িল।

প্রয়োজন?

একটা কাজ।

কিছু জানা আছে?

বলিলাম, অল্পস্বল্প!

নাম?

হরিপদ মাইতি।

দিন দুই পরে খবর করিতে বলিল। 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া আসিতেছি, ঘুরিয়া দাঁড়াইযা শুধাইলাম, বাবুব নাম।

বাবুর নামে কাজ কি, এ হইল শীল বাগান।

আমি যৎপরোনাস্তি বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, তাহা হইলে পরশুই আসিব।

আসিও।

২৩

সারাদিন গোটা শহর জরিপ করিয়া ফিরিলাম। কেশব সরকারের দেওয়া দ্বিতীয় হদিশের কোন উদ্ধার হইল না? যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি সেহ-ই বলে, বলিতে পারিলাম না।

খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে অবস্থান করিলাম। সেইখানে জোর আড্ডা বসিয়াছে। একজন একটি পদ বলিলে অন্যজন তাহার চোপা দিতেছে, কখনো কখনো দুই তিনজন একই সঙ্গে। বয়স্ক যে সে মাঝে মধ্যে ধমক দিতেছে।

ইহারা আমার অজানা নহে। বাবু বিলাসে ইহাদের স্থান রাঁড়েদের পরেই। বাবু কোন্দলে ইহাদের বড় রকমের ভূমিকা আছে।

জাতকুলের ঠিকানা নাই টঙ্কা এলো হাতে।
বাবু উঠলেন জাতে।
অহো! মুরগী পড়ল পাতে। (ধুয়া)

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, বোলে হরি বোল।

গাঁয়ে ছিল পঁচা বাওন শহরে এসে ঠাকুর।
গোরা সাহেবের কুকুর।

আরেকজন চোপা দিল,

দিনেমানে নুনের দালাল, রাতে কেনে জঙ্গল মহাল,
বাবু উঠলেন জাতে।
অহো! মুরগী পড়ল পাতে॥ (ধুয়া)

কেচ্ছা-কেচ্ছির ধুম লাগিয়া গেল।

ছোড়ো বাঙালী বাৎ ধরো সাহেরী ধাত
বাপকে মারো লাথ
বাবু উঠলেন জাতে।
অহো! মুরগী পড়ল পাতে॥ (ধুয়া)

উঠিয়া পড়িলাম। এই মধ্যাহ্ন রোদ্দুরে কোথায় যাইব? শেষমেষ বাসায় ফেরাই ঠিক করিলাম। উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইয়া পুরো অপরাহ্ন অঘোর নিদ্রায় ফুরাইলাম। কখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে জানি নাই। দরজায় শব্দ হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকার ঘর। রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া দরজা খুলিলাম। একজন বৃদ্ধলোক একটি পত্র হাতে ঘরে ঢুকিল। কাছে আসিতেই স্পষ্ট ঘনারাম।

তুমি? ঘনারাম মল্লিকবাড়ীর পরিচারক।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া হদিশ করিয়াছি।

দরকার?

চিঠি পড়িলেই বুঝিবেন।

চিঠি খুলিলাম। রাধারমণবাবু লিখিয়াছেন। চোর বাগানের মিত্তির বাড়িতে কাজ ঠিকাই হইয়াছে। আগামী কল্য যেন অবশ্য অবশ্যই কাজে যোগ দিই। এবং জানায়াছেন কেশব সরকার মহাশয় অদ্য শহরে আসিয়াছেন। তিনি বাবুর বুবাটায় এক আত্মীয় বাড়ীতে উঠিয়াছেন। সম্ভব হইলে অদ্য রাত্রিতেই যেন সাক্ষাৎ করি। বিশেষ প্রয়োজন।

কেশব সরকার আসিয়াছেন। আমি হাতে স্বর্গ পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হইল। রাধারমণবাবু আমার জন্ম হদিশ পান নাই তো? পাইলে—
ঘনারামকে বিদায় করিয়া বাহির হইলাম।

২৪

পুরান-বাজার, রূপোগাছি, নবাব-বাজার, বাঁদীহাটা, বাবুঘাটার এমন ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান যে সঠিক হদিশ পাওয়াই শক্ত,—কোন অংশে গৃহস্থবাড়ী তথা বাবু-মহল্লা, কোন অংশে পাড়া তথা বেশ্যা বাড়ী! এমন অসমসাহসিক রুচি যথার্থ ভদ্রজনে সম্ভব ভাবিয়া পাওয়াই দুস্কর। অথচ বাবুদের সামাজিক সম্মানও অল্প নহে! সমাজেরও উঁহারাই মধ্যমণি! কানে বাজিল পক্ষীদলের গান।

টাকা আছে যার সব-ই আছে তার
মানে, যশে, গুনে ধনী।
আছে লোক-লস্কর বংশ দণ্ডধর
দাপে-তাপে সম্পন্নী।

বলিতে কি গ্রামদেশে এমন সাহসিকতা ভাবাও যায় না। নষ্টামী নাই তাহা নহে, কিন্তু প্রয়োজনীয় আড়াল আছে। বলিতে পারেন, আড়াল দেওয়া নষ্টামী হইতে প্রকাশ্য নষ্টামী সহস্র গুণে ভাল।
তাহা ত বটেই। তবে আমি ভাবিতেছিলাম, এ নষ্টামী কেন? ইহা কি মনুষ্য স্বভাবান্তর্গত কিছু, নাকি নষ্ট সম্পদজাত? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ নাই। আমি সেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ কালে আন্দাজে একটি দরজায় করাঘাত করিব ভাবিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবটা এই, শুধাইয়া লইব, হরিহরবাবুর বাড়ী কোনটা? হঠাৎ দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল।
এ কী! আমি বিস্মিত, বিমূঢ়, হতবাক! চোখাচোখি হইতেই দরজা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এ কে পশ্চাতে?
একটি জুড়ি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিতেই কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা কি হরিহরবাবুর বাড়ী।
কোচোয়ান বলিল, হরিহরবাবু কে জানি না; তবে এই বাড়ী যে তাহার নহে সে হলফ করিয়া বলিতে পারে।
আমি সরিয়া পড়িলাম। কিয়দ্দুর আগাইয়া আসিয়া এক অন্ধকার গলির মুখে গা ঢাকা দিলাম।
রাত বাড়িতেছে।

২৫

রাত্রি অনেক। কত রাত? পথ ক্রমে লোকবিরল। নির্জনতা চুঁইয়া চুঁইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ দরজা খুলিবার শব্দ হইল। মনে হইল, এদিক-ওদিক তাকাইয়া সেই লোক গাড়ীতে উঠিতেই জুড়ি গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি মুহূর্তে গলি হইতে নির্গত হইলাম। গাড়ী ক্রমে দূরবর্তী হইতেছে। আমি ছুটিতে লাগিলাম। মরীয়া ছুটিতেছি।
নাহ্, গাড়ীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান পাহারাদার কেহ নাই। কোচবাক্সেই গাড়োয়ান ও

পাহারাদার দুইজন পাশাপাশি বসিয়াছে। আমি প্রাণপণে ছুটিয়া গাড়ীর পেছনে বসিলাম। একটি ধাক্কা খাইল। কোচোয়ান পাচনবাড়ির দড়ি পেছনে ছুঁড়িয়া পরখ করিল। দড়ির গিঁট কপালে লাগিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে চাহিয়াও থামিয়া গেলাম। দড়ির ঘা আরো বার কয়েক পড়িল। আমি সতর্ক হইয়া গিয়াছি। নিজেকে গুটাইয়া কুকুর-কুণ্ডলী করিয়াছি। দড়ি আর আমার নাগাল পাইবে না। কিন্তু আমি আমার অন্বেষণের উপান্তে দাঁড়াইয়া। দৃষ্টিভ্রম অসম্ভব। অতএব, হেস্তনেস্ত একটা হইতেই হইবে।

গাড়ী বেগে ছুটিয়াছে।

২৬

এমন নক্ষত্রখচিত মধ্যরজনী দেখিবার সৌভাগ্য এই জীবনে হয় নাই। দুপাশের ঝোপে-ঝাড়ে স্থির হইয়া থাকা গাঢ় অন্ধকার, আকাশে অনড় নক্ষত্ররাজি। ঝিঁ ঝিঁর শব্দ শুনিতেছি, সুতোকাটা পোকাদের গানও। মাঝে একবার এক বৃক্ষতলে তক্ষকের ডাকও বার কয়েক শুনিয়াছি। সব কিছুকে ছাপিয়া তালে তালে পতিত ঘোড়ার খুরের শব্দ, এবং ক্রমান্বয় চাকার ঘর্ঘর।

কোথায় চলিয়াছি ?

গাড়ি বাঁক লইল।

শহর হইতে কতদূর আসিয়াছি কিছুই আন্দাজ করিতে পারিতেছি না। বুঝিতে পারিতেছি না, শহরের কোন প্রান্তে এমন ঘন ঝোপঝাড়াচ্ছন্ন পথ রহিয়াছে ? অবশ্য শহরের চতুর্দিক আমার জানিত নহে। এদিকে লোক-বসতির চিহ্ন আছে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কোথাও একটি দীপচিহ্ন অথবা বসত চোখে পড়ে নাই। গাড়ী আরো আগাইলে, একটি বিশাল মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।
ক্রমে মাঠ শেষ।

এ প্রান্তরের পথিপার্শ্বে বৃহৎ বনস্পতিসমূহ ডালপালায় আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকারকে আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে গাড়ীর গতি মন্থর হইল। ক্রমে অরো মন্থর। আমি নামিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় লইলাম। নাতি প্রশস্ত ফটক দিয়া গাড়ী একটি বাগানে ঢুকিল। গাড়ীর পার্শ্বস্থ মৃদু আলো অনুসরণ করিয়া যদ্দূর সম্ভব দেখিলাম। গাড়ী অদৃশ্য হইল।

মধ্যরজনীতে বিজন বৃক্ষতলে আমি একাকী। এখন উপায় ?

রজনী দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। আমি বৃক্ষতলেই বসিয়া পড়িলাম। ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন। একসময়ে যন্ত্রণার্ত রাত্রির অবসান হইল। পাখী ডাকিতেছে। আকাশ আলোকিত হইতেছে। ভোর।

২৭

অঞ্চল একেবারে জনশূন্য তাহা নহে। গরীবগুর্বো, চাষাভুষো আছে। তাহাদের একজনকে শুধাইতে বলিল, স্থানের নাম নবগ্রাম। আর বাগানটা এক রাজার। লোকে বলে, যবনী-বাগান।

বাগানান্তর্গত রহস্যের যথার্থ খবর কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাহারা কিছু জুড়িগাড়ি আসিতে-যাইতে দেখিয়াছে। ব্যস্। রহস্য, রহস্যই থাকিয়া গেল। বাগানের লোকজন কাহাকেও পাইলাম না যে শুধাইব। নিরুপায় যে রাস্তায় আসিয়াছিলাম, সেই রাস্তায় হাঁটিতে লাগিলাম। দিবালোকে কালক্ষয় অর্থহীন। অতএব, বেলা বাড়িতে রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হইল। যে পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলে এলাকাকে মধ্য রজনীতে লোকবসতিহীন মনে হইয়াছিল এক্ষণে দেখিতেছি তাহা নহে। বসতি আছে, তবে দূরে দূরে।

o

সূর্য মাথার উপরে উঠিলে আমি শহরের নাগাল পাইলাম।

হরিহরবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া পাইলেও কেশববাবুকে পাইলাম না। আমি বেলা দ্বিপ্রহরে মধু মল্লিকের বাড়ী পৌঁছিলাম। রাধারমণবাবু 'উঠি উঠি' করিতেছেন। আমাকে মুখোমুখী দেখিয়া শুধাইলেন, গত রাত্রিতে তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমার পত্র পাও নাই?

পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। বলিলাম, আপনার পত্র মতো হরিহর হোড় মহাশয়ের বাড়ীতে কেশববাবুর সাক্ষাতে যাইতে যাইতে হঠাৎ—

কি হইয়াছে?

আমি শুধাইলাম, আপনি কি নবগ্রাম চেনেন?

নবগ্রাম! রাধারমণবাবু বিস্মিত হইয়া শুধাইলেন, উহাতে তোমার প্রয়োজন?

না, কাল সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সহিত—

নবগ্রামে তোমার কোন বন্ধু যাইতে পারে না। সত্যি বল কি হইয়াছিল?

নিরুপায় আমি তাহাকে বিস্তারিত বলিলাম। রাধারমণবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখিলেন। বলিলেন, তাহা হইলে কেশববাবু সত্যই বলিয়াছেন।

কি?

তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন, আমার সঙ্গে চল।

আমি রাধারমণবাবুর সঙ্গী হইলাম।

৩৮

রাধারমণবাবু নিরতিশয় ঘুঘু লোক। আমার পাঁচ পাঁচ বৎসরকালীন নীরবতা তিনি মৃদু হাস্যে হজম করিলেন। বলিলেন, যুবা বয়সে দিকভ্রষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তুমি বয়সোচিত মত্ততায় আচ্ছন্ন ছিলে, এক্ষণে পথে আসিয়াছ। ভালই। আর

মিত্তির বাড়িতে কাজ লইয়া কাজ নাই। তুমি যেইখানে আছ সেইখানেই থাক। তোমার অন্বেষণে অবশ্যই মদত দিব। কিন্তু তোমার কোন উপকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না ; বরং বিপদগ্রস্ত হইতে পার।

সাহসে ও সহাস্যে বলিলাম, আমি আর মৃত্যুভয় করি না।

বাহ্, বাহ্, বেশ বেশ। হাসিয়া শুধাইলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে কখনো মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিয়াছ ?

আজ্ঞে !

মৃত্যু না জানিয়া মৃত্যু-ভয়হীন হওয়া বড়ই সহজ। দেখি, তোমার ভয়হীনতা কত— বলিয়া তিনি একটি ছুটন্ত জুড়িগাড়ীর দিকে আমাকে সবেগে ঠেলিয়া দিলেন। আমি ছিটকাইয়া সরিয়া আসিলাম। ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, পিতৃতুল্য আপনার এ কী ব্যবহার ?

আদৌ অপ্রস্তুত না হইয়া তিনি অকপটে বলিলেন, পুত্রতুল্য তোমার সাহস পরখ করিতেছি।

এই উপায়ে ?

মৃত্যু-মুখোমুখী হইবার অনন্ত উপায়। ইহা তাহারই একটি।

আমি বিস্মিত হইয়া রাধারমণবাবুকে দেখিতেছি। এমন নির্মম রসিকতাও তাহার আসে ?

তা বলিয়া—

পাঁচবৎসর সঙ্গ করিয়াও আমাকে জানিতে পার নাই। চব্বিশ বৎসর জীবন যাপন করিয়াও জীবন কি বোঝ নাই। ভবিষ্যতে অমন বালোচিত উচ্চারণ আর করিও না।

o

রাধারমণবাবুকে অনুসরণ করিয়া কেশব সরকারের মুখোমুখী হইলাম। কেশববাবু সময়ে সাক্ষাৎ না করিবার জন্যে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

রাধারমণবাবু বলিলেন, আসামী হাজির করিয়াছি, এখন আমি যাই।

হরিহরবাবু বলিলেন, সে হইবে না। আপনাকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি বাড়িতে সংবাদ দিতেছি। রাধারমণবাবু কেশব সরকারের মুখ চাহিয়া হাসিয়া সম্মতি দিলেন।

ছেলে পড়া বেলায় আহার মন্দ হইল না।

আমি আমার পিতৃ-অন্বেষণের তৃতীয় ধাপে পা রাখিয়াছি।

o

বয়স্কদের আলোচনায় বয়োকনিষ্ঠদের অংশগ্রহণ করিতে নাই। আমি একাকী অন্যকক্ষে বসিয়া থাকিয়া কখন তাকিয়ার মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। কেশববাবুর ধাক্কায় যখন ঘুম ভাঙিল, তখন সন্ধ্যা। তুমি বাসায় যাও, প্রয়োজন হইলেই সংবাদ দিব।

২৯

'বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, পুরা না হোনেসে হোগা থোড়া।' আমি দেখিতেছি,

পিতৃ স্বভাবের অনেক কিছুই ইতিমধ্যে আমাতেও বর্তাইয়াছে। কর্মহীন দিবাস্বপ্নে আক্রমণ করিতেছে কমলকুমারী, ছোট বউ, বন্দনা ; রাত্রির দুঃস্বপ্নও তাহাদের চিন্তামুক্ত নহ। ভাবিতেছি এ কোন মোহময় আচ্ছন্নতায় পাঁচ পাঁচটি বৎসর পার করিলাম। কেন এমন হইল? যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে পিতার গুণাবলী? অর্থাৎ তাঁহার উদ্যম, তাঁহার সম্পন্নতা, তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা—কৈ কিছুই ত আমার হাত ধরিল না। আমি কারাস্থলিগণ্য পরিচিতজনের মধ্যে নিতান্ত অবহেলিত হইয়া রহিলাম। অবশ্য ইদানীং রাধারমণবাবু, কেশববাবু, হরিহরবাবু কিঞ্চিৎ মর্যাদা ধরিয়া দিতেছেন বটে, সেও ত অস্পষ্ট পিতৃ-পরিচয়ের দৌলতে। নিজকৃত কোন সুকৃতির অবদান ত এ জীবনকে মণ্ডিত করে নাই। ভাবিতে ভাবিতে যখন গাঢ় আচ্ছন্নতায় আপন অস্তিত্বই ঝাপসা হইয়া উঠিতেছে, তখন মনে হইল, ঘরে প্রত্যাশিত সংবাদোৎকণ্ঠায় বৃথা কালক্ষয় করিয়া কাজ কি। রামধন পাহারাওয়ালাকে বলিয়া বাহির হইয়া পড়ি।

রামধনকে বলিলাম, কেহ খোঁজ করিলে নাম-ঠিকানা সময় জানিয়া লইও। আমি বাহিরে যাইতেছি। যথা সম্ভব সত্বরই ফিরিয়া আসিব।

পথে পা রাখিয়া মনে হইল শীল বাগানে গেলেই হয়। যদি—

০

গুঁই বাগানের পথে শীল বাগানে পৌঁছিলাম।

রেলের ধক্‌ধক্‌ কানে আসিতেছে। কদাচিৎ কর্ণবিদারী সিটির শব্দ। শ্রীদাম মালীর সাক্ষাৎ সত্বরেই পাইলাম।

তুমি?

আপনি আসিতে বলিয়াছিলেন।

শ্রীদাম মালী সঙ্গে লইয়া চলিলেন। বিরাট প্রাসাদের নীচের তলার সেরেস্তায় পৌঁছিতেই নায়েববাবু বলিলেন, কি কাজ জানো?

বলিলাম, গাঁ-ঘরে একটু পড়া-লেখা শিখিয়াছিলাম। শহরে কিছুদিন ঘর-দোর সাফা করিবার কাজ করিয়াছি। বাগানের কাজও জানি।

দেখি, নাম ঠিকানা লেখো।

ধীরে ধীরে নাম ঠিকানা লিখিলাম। ইচ্ছা করিয়া মাইতির 'ই' এর টিকি দিলাম না। 'ত'-এ দীর্ঘ ঈ-কার দিলাম।

নায়েব মহাশয় কি বুঝিলেন কে জানে। শুধাইলেন, কাগজপত্র গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিতে পারিবে?

আমি সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলিত করিলাম।

বলিলেন, তাহা হইলে আজ হইতেই বহাল হও।

বলিলাম, কিছু নিজস্ব জিনিস আছে, তাহা আনিতে হইবে। আমি আগামী কল্য হইতে কাজে যোগ দিব।

ঠিক আছে। কাল-ই আসিও।

চলিয়া আসিতেছিলাম, ফিরিয়া গিয়া বলিলাম, যদি কিছু মনে না করেন, কাজের ধরণটা যদি—

নায়েব মহাশয় 'মণি' 'মণি' বলিয়া ডাকিতেই একটি আমাদের বয়সী যুবা কাছে আসিল।
বলিলেন, কিতাবখানায় লইয়া যাও। কি কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিও।
মণির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতলে উঠিয়া আসিলাম। বৃহৎ কক্ষগুলিতে অনেক লোক কাজ করিতেছে। মনিকে শুধাইলাম, ইহারা কারা ?
মণি বলিল, সে কী এক-দুইজন যে বলিব কে কি ? কোন ঘরের খবর জানিতে চাহ ?
সম্মুখের ঘরের দিকে তাকাইতেই বলিল, মোছরমান মৌলভী। ওরা পাঁচ জন।
মৌলভী ?
হাঁ গো, মোছরমানী কাগজ ছাপা হয় যে !
পাশে ঘরে আটজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তর্কের ঝড় বহিতেছে। সে ঘর ছাড়াইতেই নিজে ভয়ে কুঁকড়াইয়া গেলাম। পা সরিতে ছ না।
গোরা সাহেব !
কি হল ? আসো।
আমি তবুও স্থির।
ওরা সব সাহেব পণ্ডিত। ভয় নাই। মোদেরি মতন। চাকর।
মণি অবশেষে যে ঘরে লইয়া গেল সেই ঘরে ছাপা কাগজের পাহাড়। বড়ো এলোমেলো। আরবী, পার্শী, ইংরাজী, বাংলা কাগজের ছড়াছড়ি। বইও অসংখ্য।
শুধাইলাম, এত্তো বই-কাগজ ?
এ সব-ই গুছাইতে হইবে।
বাংলা বই দুই একখানা হাতে লইলাম। রাজা ধনপতি রায় লিখিত কিতাব। আগেই দু-একখানার মুখোমুখী হইয়াছি।
শুধাইলাম, সব-ই কি রায় মহাশয়ের লিখা ?
আহা, রাজাবাবু বল। সঙ্গে সঙ্গে মণি বলিল, শুনি ত লেখে এই সব—ঘরগুলির দিকে দেখাইল।
আমি মণির পিছু পিছু বাহিরে আসিলাম। শুধাইলাম, রাজাবাবু কখন আসেন ? এখানে ত আসেন না।
তুমি তাহাকে দেখিয়াছ ?
আমি ? মণি চমকাইল। না, দেখি নাই। গলার স্বরে বেশ জোর। তবে হ্যাঁ, একজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছি, যিনি আসিলে সরকার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়ান। লোকে বলেন, উনিই তিনি।
কেমন দেখিতে ?
ব্রাহ্মণের মতো। তবে রঙ তত ফর্সা নহে। হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, যাহা শুধাইলে শুধাইলে, কাজ করিতে হইলে আর কাহাকেও কিছু শুধাইও না ; নোকরী যাইবে।
আমি কথা না বাড়াইয়া শীল বাগানের বাহিরে আসিলাম। ঝিলের জলে লাল-সাদা অজস্র শালুক ফুটিয়াছে ; মনে হইতেছে বুঝিবা পদ্ম। রৌদ্র ঝলমল করিতেছে।

মনে মনে বলিলাম, ওই-ই হয়! রাজবাগানের শালুককেও সহস্রদল পদ্ম বলিয়া ভ্রম হয়, এমন-ই মনুষ্য মতি!

৩০

রাধারমণবাবু, কেশববাবু, হরিহরবাবু ও শহরের জনরবের দৌলতে অনেক অজ্ঞাত সংবাদও জ্ঞাত হইলাম। শুনিলাম, ধনপতি রায়ের বহুভাষার পাণ্ডিত্যের কথা। তাঁহার ধর্মজিজ্ঞাসা খৃষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন কিছুই বাদ রাখে নাই। তাঁহার বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ জ্ঞানও প্রচণ্ড। তিনি আরবী, ইংরাজী, বাংলায় অনর্গল লেখনী চালনায় পারঙ্গম। তিনি তন্ত্রে সিদ্ধ, মন্ত্রে সিদ্ধ, শৈবাচারও আয়ত্বে। শুনিলাম, তাঁহার রক্ষিতা অসংখ্য; যবনী স্ত্রীও বর্তমান। ইদানীং কোন এক গোরা সাহেবের ভগ্নীর সহিতও নাকি লটঘট চলিতেছে।

অকস্মাৎ বজ্রপতন হইল।

সংবাদ, রাজা ধনপতি রায় আত্মপ্রকাশ করিবেন। দেশস্থ ধর্মমণ্ডলের আনুকূল্যে তাঁহার মহতি সম্বর্ধনা সভা হইবে। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। প্রচারে, গুজবে, ঘটায় শহর তোলপাড়।

আমি রাধারমণবাবু সঙ্গে ওঁর আবাসেই সাক্ষাৎ করিলাম। রাধারমণবাবু সহাস্যে বলিলেন, অতঃপর পিতার সাক্ষাৎ দর্শন হইবে। তুমি খুশি ত?

আমি মাথা নত করিয়া বলিলাম, আপনার কথাই ঠিক, আত্মসন্তোষ ভিন্ন আর কোন লাভই হইবে না।

উহাও স্বল্প নহে। হাসিয়া বলিলেন, মাতৃচরিত্রে বিশ্বাস আসিবে।

কী মর্মান্তিক কি অবলীলায় উচ্চারণ করিলেন! আমি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাইলাম।

তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হইলেন না। বলিলেন, জনরব তোমার অজানা নাই। ভাবো, ইতিমধ্যে কতজন তোমার মতো অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

আমার মাতা হিন্দুমতে বিবাহিত

প্রমাণ?

তাহা হইলে গ্রামকে শহরে তুলিয়া আনিতে হয়।

আনিলেও কিছুই প্রমাণিত হইবে না।

আমি পারিলে তখনই রাধারমণবাবুর টুটি টিপিয়া ধরিতাম। বলিলাম, আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন।

তিনি রসিকতা করিয়া বলিলেন, তা বলিয়া তোমাকে জারজ বলিতেছি না।

কী? প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়িলেও আমি এত চমকাইতাম না। এ যে মৃত্যুরও অধিক। রাগে, ক্ষোভে, ক্রোধে, নিরুপায় আমি একরাশ কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলাম।

রাধারমণবাবু আমার মস্তকে হাত রাখিলেন। নিরতিশয় মমতা মাখানো কণ্ঠে বলিলেন, এত সহজেই ভাঙিয়া পড়িলে! আমি কিন্তু তোমাকে ক্রমাগত মৃত্যুর মুখোমুখী

করিয়া পরখ করিতেছিলাম মাত্র। আমি তোমার মাতৃ-চরিত্র সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ করি না। কেশববাবু তোমার মামা শ্যামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়াছেন, তোমার পিতা ধনপতি সওদাগর-ই। অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। তুমি ওঠো।

আমি অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিলাম।

বলিলেন, এই বৃহৎ মনুষ্য সংসারে বৈধাবৈধ তেমন গূঢ় প্রশ্ন মোটেই নহে। পুরুষার্থ'ই শেষ কথা। তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠ করো, জয়ধ্বনি অবশ্যই দূরে থাকিবে না।

আমি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

[তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত]



চতুর্থ পর্ব — শ্রীমন্তের অন্তিম মাতৃ-সম্বোধন

হতভাগিনী, গর্ভধারিণী মা আমার, আমি জানি, এই পত্রের মর্মান্তিক অভিমানাচ্ছন্ন বাক্যবন্ধসমূহের যথার্থ মর্মার্থ কোনদিন-ই তুই সম্যক হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবি না, কারণ, তুই অক্ষর পরিচয়হীনা, নিতান্ত গ্রামীণ, আবহমান লোকযাত্রা, লোকচর্যা ও লোক-সংস্কারের মোহে আদ্যন্ত আচ্ছন্না, নেহাতই অদূরদর্শিনী, স্বভাবে সরলা এবং সর্বাবয়বে মৃন্ময়ী।

মাগো, তবুও তুই-ই সর্বমঙ্গলা মা আমার, সুখ-দুখ-স্নেহ জাগানিয়া জননী, রক্তে বহমান তোর রক্ত ;—আমার বিগত দিনের বাড়িয়া ওঠা তো তোর-ই প্রাণান্ত পরিশ্রমের সগর্ব সফলতা। তোর নদীরূপিনী শিরায় শিরায় নিত্যবহতা অনন্ত স্নেহধারা, তোর শ্যামল-সফল শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ধরিয়া রাখা থরো থরো অমল ছায়া-সান্ত্বনা, তোর উচ্চারণে-হাসিতে-দৃষ্টিতে ছড়িয়ে থাকা অপরিমিত মমতা, তোর অনন্ত প্রসারিত দুই হাতের অমৃত বেষ্ঠনে আবদ্ধ সান্ত্বনারূপী বিশাল আকাশ—জননী গো, তোর নিতান্ত অবোধ সন্তানের দুঃসহ হৃদয়ভার লাঘবের শেষতম অবলম্বন ত তুই-ই। অমোঘ সান্ত্বনা ধরিয়া দিলে তুই-ই দিবি, ধিক্কারে-তিরস্কারে লাঞ্ছিতক রিতে হইলেও করিবি তুই-ই; আদরে, আপ্যায়নে, আলিঙ্গনে, স্নেহে এতো ক্ষমা, সর্বংসহা তুই ছাড়া এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে কে আর ধারণ করিতে পারে ?

তোর বর্ণিত তোর শ্রদ্ধেয় স্বামীমুখ আমি সন্দর্শন করিয়াছি ; আমার পিতৃমুখও। ধন্য হইয়াছি কিনা শুধাইয়া কাজ নাই ; ঘৃণালাঞ্ছিত হইয়াছি কিনা সেই অমোঘ প্রশ্নও অবান্তর। জননী আমার, শুনিতে মর্মান্তিক হইবে জানি, তবু নিরুপায় বলিতেছি, তুই বিধবা হইলেই আমার অশেষ সান্ত্বনা থাকিত ; এমন কি আমি জারজ হইলেও—এই রক্তাক্ত পত্র রচনার দায় পোহাইতে হইত না ; আমি সানন্দে বাঁচিতে পারিতাম। অনেকানেক সুখের মতো অপরিমেয় বাঁচার সুখও আমার হাত ধরিল না, জন্মজ উত্তরা-ধিকার দাবী করিতে গিয়া আমি নিঃস্ব হইলাম, রিক্ত, হৃতসর্বস্ব ; যথার্থ ভিখারী।

রাধারমণবাবু নামক একজন, যাঁহার অধীনে বিগত পাঁচ-পাঁচটি বৎসর কর্ম করিয়াছি, তিনি আমাকে নিতান্ত পরিহাসচ্ছলে দুই দুইবার অনায়াস মৃত্যুর সম্মুখীন করাইয়াছেন ; আমি ভয়ে, আতংকে আড়ষ্ট, ঘৃণা ও ধিক্কারে ক্রোধান্ধ—সেই অমানুষিকতা সত্যই অভাবিত। কিন্তু এক্ষণে সেই ভয় আর নাই, সেই ক্রোধও না। আমি বড়ো দুঃখে বুঝিয়াছি, এই সংসারে যাচক হইয়া বাঁচিয়া থাকা বৃথা ; নষ্ট-ভ্রষ্টের উত্তরাধিকার সম্বল করিয়া জীবনযাপন অর্থহীন ; মান তথা মূল্যবোধই যদি বিনষ্ট তাহা হইলে মনুষ্য পরিচয়ই ত ধুল্যবলুণ্ঠিত ;—দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, মুখ, মাথা ইহা ত মানুষ অভিধার জন্য যথেষ্ট নহে। মেধানির্ভর মানজ্ঞান-ই যদি উহ্য তবে অবশিষ্ট কি ? মানের হুঁসই যদি না রহিল তবে আমি মানবপুত্র কেন ? মানুষ কেন ? কোন অধিকারে ? অতএব, আমার বাঁচার ইচ্ছা আর অবশিষ্ট নাই, আমি অবধারিত মৃত্যুর হাত ধরিতে চলিয়াছি। জানি, করধৃত সে আমাকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিবেনা ; আমার ইচ্ছাই আমাকে তাহার আলিঙ্গনাবদ্ধ করিবে, এবং সে যেকোন মুহূর্তেই সম্ভব। কিন্তু তৎপূর্বে আমার আরো কিছু বলিবার আছে। আমি—

'পিতা' শব্দে যে বৃহৎ বিশালতা, যে সুনির্ভর দিগন্তগ্রাসিতা, যে ভূমিবিদ্ধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, আমার জন্মদাতার অস্তিত্বে, তাঁহার দেশবিদেশভাসিত প্রতিষ্ঠায়, তাঁহার অফুরন্ত সম্পন্নতায়, আমি কণামাত্রও অনুভব করি নাই। মনে হইয়াছে, ছল-ছলনা-চতুরতার বর্মাচ্ছাদিত এক দুর্ধর্ষ লম্পট হঠাৎ সম্পন্নতার হাত ধরিয়া আপামর দেশবাসীর চোখে ধুলা দিয়াছে, দিতেছে। হঠাৎ সম্পন্নতার ইহাই ধর্ম। লাম্পট্য হঠাৎ-সম্পন্নতার ছায়াসঙ্গী; ছল-ছলনা-চতুরতারও। ঐ পিতার পুত্র বলিয়া ঐ সমস্ত গুণরাজী আমাকেও রেহাৎ করে নাই; আমি হতভাগ্য কোন অর্থে সম্পন্ন না হইয়াও শুধু সম্পন্নের আশ্রয়ে দিনযাপন কারণে দেহেমনে সর্বাংশে আক্রান্ত; পাপগ্রাসিত। নষ্ট কাল নিরন্তর ভ্রষ্টতার দিকে খেদাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই মোহ-পাশ-বন্ধন ছেদন করিব তেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমার হাতে নাই। অতএব, নষ্ট পুত্রমুখ দেখিয়া তোর কাজ নাই; আমি দূর হইতেই বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, কারণ, আমি তোর গর্ভের অহঙ্কার নই।

শুধাইতে পারিস্, কি এমন অঘটন ঘটিল যে স্বামী-স্নেহসুখবঞ্চিতা হতভাগিনী আমার একমাত্র পুত্র মুখ দেখিবার অমল সৌভাগ্য-সুখও হাতছাড়া হইবে?

অনন্যোপায় বলিতেছি, কূট-কাল-প্রশ্রয়-সম্পন্ন স্বামীকে আপন করিয়া রাখিবার কোনো মহামন্ত্র, কোনো ছলা-কলা, জননী আমার, তোর হাতে ছিল না; নাই। তোর শাঁখা-সিঁদুর, তোর পাল-পার্বন, তোর ব্রত-পূজা, তোর মঙ্গল-ভাবনা পশ্চিমতাড়িত কাল-ঝঞ্ঝা ছিন্নপত্রের মতো উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। তোর পুণ্যিপুকুর ব্রতের সেই 'হয়ে পুত্র মরবে না, পৃথিবীতে ধরবে না'—সম্পদশাসিত পৃথিবীতে বড়ো হাস্যকর শুনাইতেছে; প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে অংশীদারের অবরোধে। বলাবাহুল্য, সেখানে আমিও অবাঞ্ছিত। আর অবাঞ্ছিত যে, তার সর্বনাশ ত চতুর্দিকে।

স্বপ্ন-মোহাচ্ছন্ন গর্ভধারিণী তুই, যাকে ধান-দূর্বার আশীর্বাদী মাথায়, দধি-গুড় মুখে, হৃদয়মথিত 'দুগ্গা' 'দুগ্গা' উচ্চারে পিতৃ অন্বেষণে পাল তোলা নৌকায় তুলিয়া দিয়াছিলি, আর যে এখন দূর শহর হইতে আর্ত বাক্যবন্ধে নিরুপায় পত্র লিখিতেছে, এই দুইয়ের ভিন্নতা এতো যে তুই হঠাৎ দেখিলে চিনিতেই পারিবি না। সম্পন্নতা-জনিত যে সমৃদ্ধি রূপবদলের প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা তাহা নহে। কোনভাবেই সে সম্পন্ন নহে; প্রতিষ্ঠাও তাহার হাত ধরে নাই; তবুও সে অন্য, ভিন্ন, তোর নিতান্ত অপরিচিত। শহুরে সম্পন্নের আশ্রয়ে, নাগর-মানসের বিপুল দাপটে তাহার নিপাট গ্রাম্য সারল্যের সমূহ সর্বনাশ ঘটিয়াছে। তার অমল মুখাবয়বে এখন শহুরে বসন্ত-চিহ্ন, তার শ্রীমুখ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। তার চোখে এখন আদিগন্ত উদ্ভাস শ্যামলী তুই নয়, তোর অমল-শ্যামল দিবস-রজনী সেই কবে মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তার দিন জুড়িয়া কমলকুমারী, ছোট বউ, বৃন্দারা; রাত্রি জুড়িয়াও তাহারাই। সদ্যোস্ফুট গ্রাম্য কুসুমবালা, যাহাকে পরিণয়ের স্বপ্ন সে ক্ষণকাল দেখিয়াছিল, কথা দিয়াছিল, শহরে পৌঁছিতেই সে হারাইয়া গিয়াছে। ছলা-কলার অনলে সারল্য অনায়াসে ভস্মসাৎ। এহো বাহ্য।

আমার জন্মদাতা পিতার এক মহতি সম্বর্ধনা সভা এই বিশাল শহরে সম্প্রতি প্রচণ্ড জাঁকজমক সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। সংবাদ এই, তিনি অদূর ভবিষ্যতে সাত সমুদ্র

তের নদী পার হইয়া গোরাদের দেশে যাইবেন। সঙ্গী হইবেন কিছু গোরাপুরুষ ও এক অপূর্ব সুন্দরী গোরা রমণী। জনরব, তিনি সনাতন, শাক্ত, শৈব ও ইসলাম মতে পাণিগ্রহণ সম্পূর্ণ করিয়া ইদানীং খ্রীষ্টীয় মতে পাণি-পীড়নে উদ্যোগী। ধনাঢ্য ও প্রতিষ্ঠের আকাঙ্ক্ষায় সীমা নাই। ভোগসুখেরও না। লাভ কি সেই সাতকাহনে। বরং বলি, যে জন্মদাতা একদিন নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে আমাকে পলকমাত্র দর্শনে ভয়ে দ্বার দিয়াছিলেন, সেই তিনি বিশাল সভায় অতি নিকট হইতে বারম্বার মুখোমুখী দেখা সত্বেও, বার কয়েক নিষ্পলক, বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করেন নাই। একবার মনে হইয়াছে, তিনি মৃদু হাসিতেছেন। আমি যে তাঁহার ভয়ের কারণ মাত্র নহি বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মস্তক আপনা হইতেই নত হইল। বুঝিলাম, যাহা শুনিয়াছি তাহা অতিরঞ্জিত কিছু নহে, আমার মতো তাঁহার অনেক পুত্র পথে-ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে। এতোজনের উত্তরাধিকার তিনি স্বীকার করিবেন এমত উদার তিনি নহেন। অতএব, ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিয়া অস্বীকৃতিজনিত দুঃখে ও লজ্জায় অধোবদন হওয়ার চাইতে, দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার তথাকথিত মহৎ কৃতিত্ব অবলোকন-ই নিরতিশয় শ্রেয় মনে করিলাম। তিনি সেই মহতি সম্বর্ধনা সভায় অনায়াসে বহুতর অমূল্য বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ধন্য ধন্য রব উঠিল। করতালী আকাশ বিদীর্ণ করিল। জয়ধ্বনি দিক কাঁপাইল। হায়! মন্দভাগ্য জনগণ! কষ্টিপাথর কোন দিন-ই তোদের হাতে পড়িল না, পড়িতে দিল না। ব্যষ্টির মতলবী উচ্চারণ সমষ্টিকে প্লাবিত করিল। চাপানো সিদ্ধান্ত বিনাতর্কে প্রতিষ্ঠা পাইল। হায় রে!

সেই সম্বর্ধনা সভায় তথাকথিত প্রিয়জন ও সজ্জনেরা তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা, সাধনা, ও সাফল্যের বহু বিশেষণযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, তাঁহার সততা, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা, তাহার নীতিপরায়ণতা তর্কাতীত। বলিলেন, তাঁহার বিদ্যা অনন্ত, তাঁহার জ্ঞান অসীম, তাঁহার ধর্মবোধ অতুলনীয়। তিনি যুগনায়ক; তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত। অহো! বশংবদদের উচ্চারণে অবশ্যই বাহুল্য থাকে, কিন্তু এতো! শুনিতে শুনিতে মনে হইল, আমি যাহা জানিয়াছি, শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, সব-ই ভুল। মনে হইল, এমন মায়াচ্ছন্নও মানুষে হয়! এমন ভ্রম দর্শন!
মাগো! পোষ্যজনের মিলিত উচ্চারণের সংক্রমণ ক্ষমতা তোর জানিবার কথা নহে। অনেকে বলিলে ডাঁহা মিথ্যাও ক্রমে সত্য হইয়া ওঠে। নিরুপায় আমি রাগে, ক্ষোভে দুঃখে সেই ভীড়ের মধ্যেই উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া বলিলাম, ওই নচ্ছার লম্পটের জনকত্ব আমি অস্বীকার করি। আমি জারজ হইব, তবু উহাকে কিছুতেই পিতা বলিব না। থুক্, থুক্। আশপাশের লোকজন আমাকে পাগল ঠাওরাইয়া, মতলবাজ ঠাওরাইয়া, নিন্দুক ভাবিয়া, কিল-চড়-লাথি ও গলাধাক্কা দিয়া ভীড়ের বাহির করিয়া দিল। তখনো আমার দৃষ্টি ওই উচ্চ মঞ্চের দিকে। হঠাৎ কোলাহলে তখন সবার-ই দৃষ্টি এই দিকে, তিনিও দেখিলেন এবং চকিতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। দেহে-মনে রক্তাক্ত আমি পুনর্বার ঘৃণার উচ্চারণ করি নাই; শুধু ফিরিয়া ফিরিয়া নিজেকে মনে মনে ধিক্কৃত করিয়াছি, আপন জন্মকেও।
আমি দিব্য দেখিতেছি, ওই নীতিভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট মানুষটাই সম্পদ ও সঙ্গীর দৌলতে মহত্বের শিরোপার্মাণ্ডত। তাঁহাকে সেই স্থানচ্যুত করে সাধ্য কাহারও নাই।

ইতিহাস তাঁহার হাত ধরিয়াছে, নষ্ট কাল তাঁহাকে মদত দিতেছে। আমি পষ্ট দেখিতেছি, কালে কালে তিনিই বিচিত্ররূপে সমর্বধিত হইতেছেন ; পোষ্য জীবনীকারদের দৌলতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদেরও।

মন্দভাগিনী জননী আমার, অতঃপর উহাঁরাই তোর ইতিহাস, তোর অহংকার, তোর গর্ব। সম্পদের দৌলতে উহাঁদের কেহ রাজা, কেহ রাজপুত্র, কেহ উজীর, নাজীর, জমিদার, মুৎসুদ্দী। তাঁহাদের সম্পদ ও সম্পন্নতা চোখ ভরিয়া দেখিবার মতো। তাঁহাদের ভোগ ও বিলাস ধূলিকে সুবর্ণ করে, পাঁচীকে পাণ্ডালী। তাঁহাদের ভোগবিলাসোদ্ভূত দান-ধ্যানেরও নমুনা স্বল্প নহে; প্রচারে প্রচারে সেই সমস্ত তিলও তাল। উহাদের মধ্যে দানসাগর, দীনবন্ধুও অল্প নহেন। কেহ-ই দেখেন না, কোন দীনাতিদীনদের রক্তমোক্ষণে ওনারা দীনবন্ধু! বলাবাহুল্য, ইহাই ঐতিহাসিক মানব-যাত্রার রসিকতা। অথচ নষ্ট-ভ্রষ্ট ইহারাই হাতধরাধরি করিয়া নীতি ধর্মের নামে ইতিহাসের চাকা ঘুরাইতেছেন; পথবদল। মনে হইতেছে, কালচক্র সত্যই কালগ্রাসিত। স্পষ্ট দেখিতেছি, সর্বনাশ সর্বগ্রাসী হইয়া আসিতেছে। আমার নষ্ট রক্তেও সেই সর্বনাশের বাজনা বাজিতেছে; প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই, ভাসিয়া যাইবার নষ্ট সুখে আমার শহরবাসের পাঁচ-পাঁচটি বৎসরও ত বিগলিত। কাহাকে দোষ দিব? রক্ত ত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। অতএব—

দেশ যাক; দেশজ চর্যা, সংস্কার, মূল্যবোধ যাক; বেঁচে থাক আমদানী কৃত সম্পন্নতা ও তজ্জনিত তথাকথিত ভোগ, ও সুখ। বিদ্বজ্জনেরা, বিদগ্ধজনেরা বলিতেছেন, উহাতেই এই দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল; মধ্যযুগীয় অন্ধকার ডিঙাইবার একমাত্র উপায়। হয়ত! তবে আমি জানি, এই বিদ্বজ্জনেরা, বিদগ্ধজনেরা পোষ্যজন। উহাঁরা নিরুপায়। নুন খাইলেই গুণ গাহিতে হইবে। সায় দিতেই হইবে।

মা আমার, এই নষ্ট কালে সম্পন্নজনের তথাকথিত বিদ্বান হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথাকথিত বিদ্বজ্জনের দারিদ্র্য ঘোচাইবার উপায় অজানা। নিরুপায় তাঁহাদের কোন না কোন সম্পন্নজনের পোষ্য হইতেই হইবে, নচেৎ প্রতিষ্ঠানের। জীবন ত ফেলনা কিছু নহে। অতএব, বিদ্যা বিক্রয় করিয়া বিদ্বজ্জনেরা জীবিকা-নির্বাহ করিবে; আর বিদ্যা ক্রেতা সম্পন্নজন স্বনামে বিদ্যা প্রচার করিয়া লাভ করিবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। হা ঈশ্বর! যে বিদ্যা নিরন্তর ক্রেতামুখাপেক্ষী, সে কী বিদ্যা?

আসলে ঐতিহাসিক মানুষের ইতিহাসই অনন্ত শোষণ-বঞ্চনারই ইতিহাস। আদি মধ্য যুগের শোষণ এত চাক্ষুষ ছিল কিনা জানা নাই, ব্যবধানও এত বিশাল মনে হয় না। উদ্ভাবনে উদ্ভাবনে সম্পদের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে; অতএব, শোষণ সহস্রমুখী, হইবেই। যে ভাবে কূট মানুষের হাতে এই ধরিত্রী লাঞ্ছিতা, ঠিক সেই ভাবেই তুমি লাঞ্ছিতা সম্পন্ন স্বামী হস্তে, আমি লাঞ্ছিত নষ্ট পিতৃরক্ত উত্তরাধিকারে।

সর্বংসহা জননী আমার, আমরা চিরকালের সেই বঞ্চিতের দলে। সময় আমাদের হাত ধরিবে না, সম্পদ আমাদের নাগালে আসিবে না, প্রতিষ্ঠাও যথারীতি দূরে দূরেই চঙ্ক্রমণ করিয়া ফিরিবে। বলা বাহুল্য, মানুষের বিগত ইতিহাসে নিরন্তর কূটমানুষেরই জয়জয়কার। ইতিহাস তাহাদের হাত ধরিয়াই পাড়ি দিয়াছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন

বস্তুর ইতিহাস-ই মানুষের ইতিহাস ; মেনে-মানিয়ে নেওয়া প্রতিবাদ-প্রতিরোধহীন ইতিহাস-ই মানুষের ইতিহাস—ঠিক নয়।

মা আমার, ক্রমে আলো আসিতেছে। আমি সেই গাঢ় অন্ধকার অপসারণের দুর্মর আশা বুকে ক্রমে তোর দূরবর্তী হইতেছি। দিকভ্রষ্ট, নষ্টচরিত্র স্বপুত্র মুখ সন্দর্শনে তোর আর কাজ নাই। জানি, তুই তাকে সুস্থমনে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিবি না। স্নেহবশতঃ প্রীতি-সম্ভাষণে কি লাভ! বরং আমাকে মৃত বলিয়াই গণ্য করিস্। কিন্তু যদি তুই কখনো দেখিস্, ইতিহাসের সুস্থ পট পরিবর্তন ঘটিতেছে ; যদি তুই দেখিস্ মহাকাল তাঁহার অমোঘ জাল ফেলিয়া নির্লজ্জ পরানুকারীদের ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মান-জ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ উদ্যোগী স্বজনদের কোলে তুলিয়া লইয়াছে ; মাগো মা, তুই অবশ্যই পুত্রবৎ তাহাদের স্ব-পুত্র বলিয়া চিনিয়া লইবি ; জানিবি, আমিও সেই তাহাদের-ই মধ্যে আছি, থাকিব।

মন্দভাগ্য জননী! তোর হতভাগ্য পুত্র মানজ্ঞানহীন কালগ্রাসিত কালের হাতে নিরুপায় বন্দী। তার মুক্তি আপাতত মৃত্যু-ছায়ায় আচ্ছন্ন। এক্ষণে অ-মানুষ ও অক্ষম তাকে অবশ্যই সাশ্রুনয়নে ক্ষমা করিস্।

বিদায় ॥

[পিতা-পত্র সমাপ্ত]